অগ্রহায়ণ ১৩৮৪

আনন্দমেলা

শুরু হল
তিনটিনের
নতুন গল্প

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি এবং স্ক্যান করে দিয়েছেন শুভজিত কুণ্ড

এডিট করেছেন সুজিত কুণ্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcvbertron@gmail.com

কোঠারীর বস্ত্রসম্ভার

মজবুত, টেকসই, আভিজাত্যে মনোহর

কোঠারীর বস্ত্রসম্ভার ঐতিহ্যের সৌন্দর্য ও আধুনিক সুরুচির এক অপূর্ব সমন্বয়। তাইতো আপনি সবসময় সবখানেই অতুলনীয় পোশাকে অনন্য ব্যক্তিত্বে উজ্জ্বল।

কোঠারীর পলিয়েস্টার (কটন মিশ্রিত) শার্টিং ও স্যুটিং (৮০/২০, ৬৭/৩৩ ও ৪৮/৫২ মিশ্রণ) আর সাড়ী।

কোঠারীর রাজেশ্বরী—সুপারফাইন হাই টুইস্ট ভয়েল সাড়ী।

কোঠারীর মলমল, লংক্লথ, পপলিন ও লন বীচড্, মার্সারাইসড্, ডায়েড ও প্রিন্টেড।

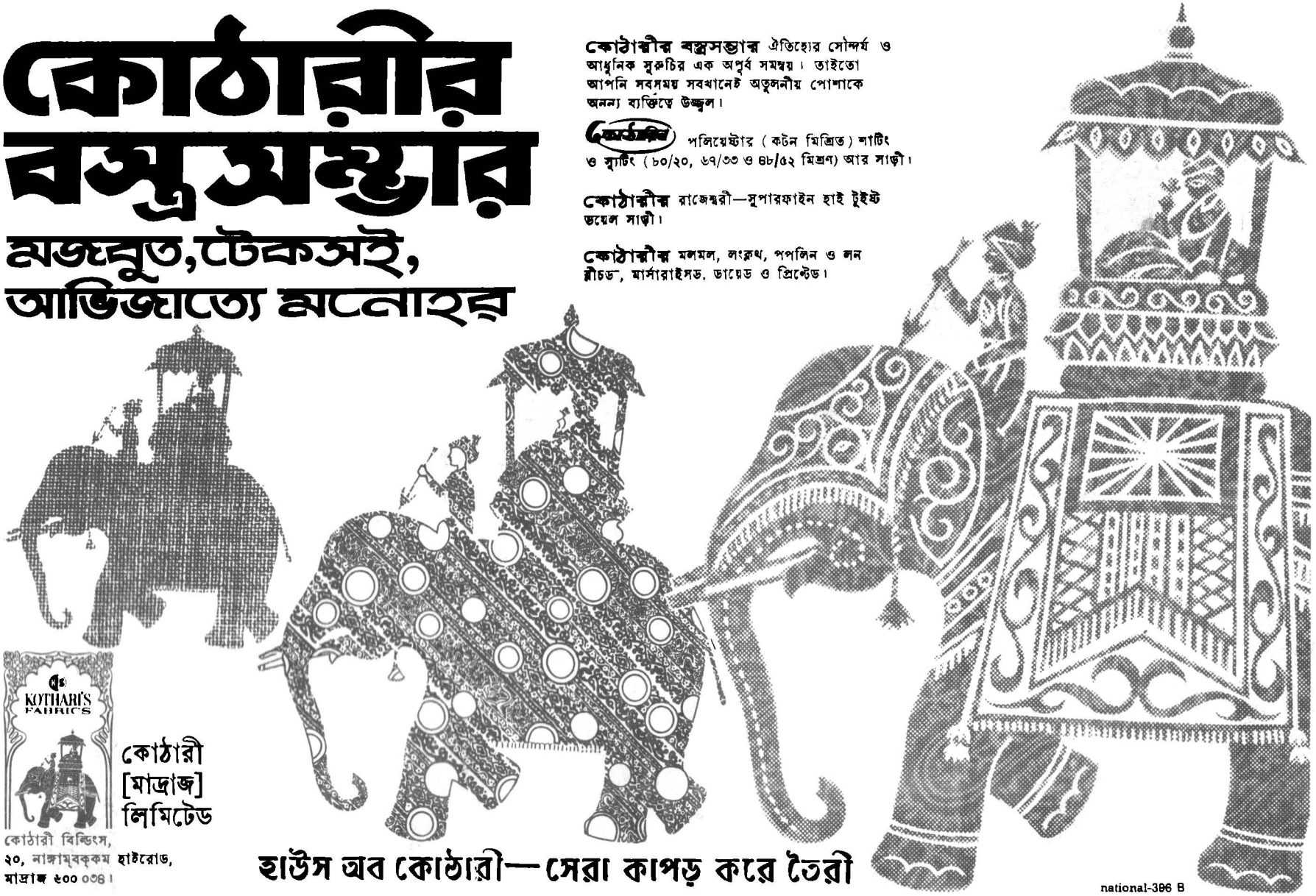

KOTHARI'S FABRICS

কোঠারী [মাদ্রাজ] লিমিটেড

কোঠারী বিল্ডিংস,
২০, নাঙ্গামবক্কম হাইরোড,
মাদ্রাজ ৬০০ ০৩৪।

হাউস অব কোঠারী—সেরা কাপড় করে তৈরী

national-396 B

আনন্দমেলা

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য মাসিকপত্র
বিজ্ঞপ্তি নং ৩৬৯ (১৬) টি-বি-সি ; তারিখ ১১ জানুয়ারি, ১৯৭৭
অগ্রহায়ণ ১৩৮৪ নভেম্বর ১৯৭৭ তৃতীয় বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা
দেড় টাকা

বিশেষ রচনা	মাধুরীলতার ভাইফোঁটা । মানসী দাশগুপ্ত ২৫
বনের খবর	গোরিলার সঙ্গে । সন্দীপ সরকার ৪
আত্মকথা	খেলতে খেলতে । চুনী গোস্বামী ১১
গল্প	লালটেম । শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ৭ প্ল্যানচেট । পার্থ চট্টোপাধ্যায় ৪০
উপন্যাস	অলৌকিক । বিমল কর ১৬ বন্ধ ঘরের আওয়াজ । সমরেশ বসু ৩৬
ছড়া	দো'নলা । অমূল্য পাল ৪৩ অ্যাই ন্যাড়া । রঞ্জন ভাদুড়ী ৪৩
কমিক্‌স	গাবলু ১৫, ভুতুড়ে গাড়ি ১৯, টারজান ২২ টিনটিন ৩০, নোলেদা ৫৩
খেলাধুলো	শীল্ড জিতল মোহনবাগান । পুষ্পেন সরকার ৪৫ মোহনবাগান বনাম কসমস । মুকুল দত্ত ৪৭ 'আমিই খেলতে পারিনি' । চিরঞ্জীব ৪৯ ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া । সুব্রত সরকার ৫০
লেখাপড়া	স্যার রমেশ মিত্র গার্লস' হাইস্কুলের প্রধান-শিক্ষিকা কী বলেন ৩২ কীভাবে তৈরি হচ্ছে ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট গার্ল ৩৩
ধাঁধা-মজা-রহস্য	আটখানা ২৮, ধাঁধা ২৮, কিসের ফটো ২৯ কিসের ছবি ২৯, শব্দ-সন্ধান ২৯
অন্যান্য লেখা	তোমাদের পাতা ২১; মজার পড়া । কুন্তক ২৪ ডোডো-তাতাই । তারাপদ রায় ৪৪; বিশ্ববিচিত্রা । দিদিমণি ৪৪ মণিমেলার খবর ৫২; আঁকো । রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৪ শেখো । কারিগর ৫৪
প্রচ্ছদ	বিশ্বরঞ্জন রক্ষিত

সম্পাদক : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডএর পক্ষে বাদপাদিত্য রায় কর্তৃক
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে
প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড, পি ২৪৮
সি. আই. টি. রোড, কলকাতা-৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত।

বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ১৫ পয়সা, পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

গোরিলার সঙ্গে

শীতকালের ছুটির দিনে আমরা সবাই তো চিড়িয়াখানায় ভিড় করে জন্তু-জানোয়ার দেখতে যাই। সুযোগ পেলে কেউ হয়তো সংরক্ষিত বনের মধ্যে পশুপাখি দেখতে যায়। কারো আবার শখ থাকে শিকার করার। কাউকে হয়তো বন-বিভাগের কাজ নিয়ে বনে-জঙ্গলে থাকতে হয়। আজকে আমি তোমাদের ডিয়েন ফসি নামে একজন অসাধারণ মহিলার কথা বলব। তিনি

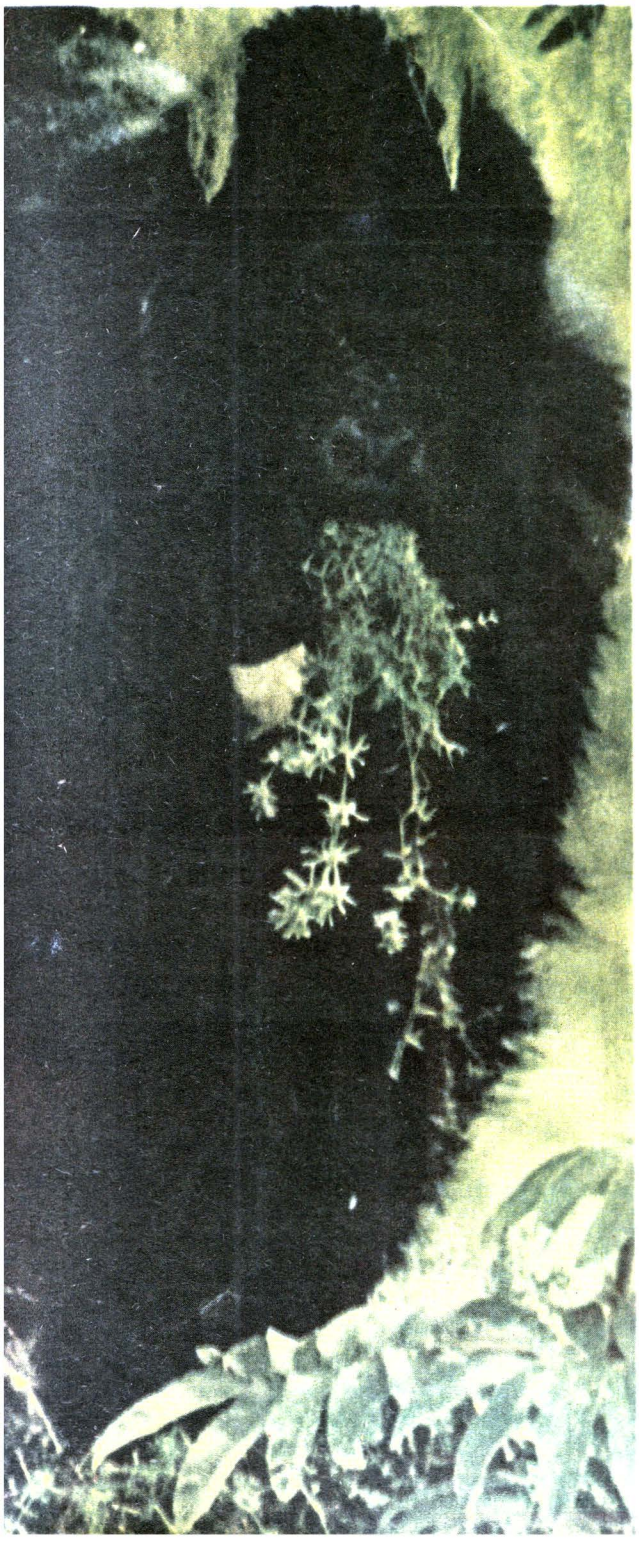

গোরিলাদের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে গবেষণা করতে মধ্য পূর্ব আফ্রিকার জঙ্গলে কাটিয়েছেন কিছুকাল। মধ্য পূর্ব আফ্রিকার দেশটার নাম রওয়ানডা। অঞ্চলটার নাম পার্ক দ্য ভলকান। দুটো পাহাড়ের মাঝখানে তিনি নিজের জন্যে ছোট্ট সুন্দর বাসা বানিয়েছিলেন। বাসার একপাশে ১২,১৭৫ ফুট উঁচু ভিশোক পর্বত। অন্যপাশে ১৪,৭৮৭ ফুট উঁচু কাশিরিম্বি পর্বত। আশেপাশে যেসব গোরিলা থাকত, মানুষের তাড়া খেয়ে তারা নির্জন-বনজঙ্গল-ঘেরা এই পাহাড়ী অঞ্চলে থাকতে শুরু করেছে। মানুষের হাতে প্রাণে মারা পড়া তো আর কাজের কথা নয়!

ডারউইনের গবেষণা থেকে আমরা জেনেছি, বানর-জাতীয় জীবরা পরিবর্তিত হতে-হতে ক্রমে মানুষ হল। ওরা সেই হিসাবে আমাদের নিকট-আত্মীয়। চিড়িয়াখানায় তোমরা লেমুর, বনমানুষ, বাঁদর দেখেছ অবশ্যই। এদের হাবভাব মানুষের মতো। মানুষের ভাবভঙ্গি ওরা নকল করতে পারে। এদের মধ্যে 'এপ' বা বনমানুষ জাতীয় প্রাণীর প্রধান বিশেষত্ব হল, মানুষের মতো এদেরও লেজ খসে গেছে। 'এপ' বলতে শিম্পাঞ্জি, গিবন, গোরিলা আর ওরাংওটাংকে বোঝায়। এরা সবাই একটু কুঁজো হয়ে দুই পায়ে হাঁটে। হাতগুলো পায়ের চেয়ে বড় বড়। দুই হাতে পাঁচটা করে দশটা আঙুল থাকে। দুই পায়েও। এদের মাথার ঘিলুর সঙ্গে মানুষের মাথার ঘিলুর মিল আছে। অবশ্য পরিমাণে মানুষের মস্তিষ্ক বেশি। কিন্তু এরাও মাথার ভেতর বহু খবর সংগ্রহ করে রাখতে পারে, সুতরাং মানুষের চেয়ে এদের বুদ্ধি কম হলেও, অন্য জন্তু-জানোয়ারের চেয়ে অনেক বেশি।

এরা নিরামিষ খায়। ফলমূলপাতা খেয়ে থাকে। বাচ্চারা মায়ের বুকের দুধ খায়। এরা দল বেঁধে বনে-বনে ঘুরে বেড়ায়। দলে থাকে একজন পুরুষ দলপতি। দলের অন্য পুরুষদের এর কথা মেনে চলতে হয়। তাছাড়া থাকে মেয়েরা আর কাচ্চাবাচ্চারা। দলপতি বা পালের গোদা দলের নেতৃত্ব করে। দলের অন্য পুরুষ কেউ যদি বেশি ওস্তাদি করে, তাহলে পালের গোদা তাকে দল থেকে তাড়িয়ে দেয়। তখন এইসব দলছুট পুরুষগুলো সন্ন্যাসীর মতো ঘুরে বেড়ায়।

ডিয়েন ফসি গোরিলার ওপর গবেষণা করতে আফ্রিকার গহন অরণ্যে বাসা বেঁধেছিলেন। গোরিলারা দুই জাতের হয়। এক জাতের নাম 'গোরিলা গোরিলা', অন্য জাতের নাম 'গোরিলা বেরিঙ্গি'। শব্দটার সঙ্গে আমাদের 'ফিরিঙ্গি' শব্দটার মিল আছে না? গোরিলা গোরিলা পশ্চিম আফ্রিকার জঙ্গলে থাকে। গোরিলা বেরিঙ্গি এপ-দের মধ্যে সবচেয়ে বড়। দেহের ওজন চারশো থেকে পাঁচশো পাউন্ড হয়। মধ্য পূর্ব আফ্রিকার অরণ্য-ঘেরা পাহাড়ী অঞ্চলে এরা থাকে।

ডিয়েন প্রাণিবিদ্যা নিয়ে পড়াশুনো করতেন ইংলণ্ডের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রাণিবিদ্যা নিয়ে গবেষণা করতেই তিনি আফ্রিকায় কাটিয়েছিলেন বছর তিনেক। নিজের কাছে ক্যামেরা থাকলেও তাঁর কাছে ফোটো তুলতে রবার্ট ক্যাম্বেল গেছেন মাঝে মধ্যে। কিন্তু বেশিরভাগ সময়টা তিনি একাই কাটিয়েছেন। নির্ভয়ে গোরিলাদের মধ্যে ঘুরে বেড়িয়েছেন। পিছিয়ে পড়লে দুরবিন চোখে লাগিয়ে তাদের কাণ্ডকারখানা দেখেছেন। বা টেলিফোটো লেন্স এঁটে ছবি তুলেছেন। তাঁর বাসায় থাকত আর দুটি প্রাণী। কুকুর সিন্ডি আর পোষা বাঁদরের বাচ্চা কিমা। হালকা চেয়ার-টেবিল পেতে ডিয়েন টাইপরাইটারে গোরিলাদের বিবরণ খটাখট লিখে ফেলতেন। তোমাদের মধ্যে কেউ হয়তো ডিয়েনের মতো প্রাণিবিদ্যা নিয়ে গবেষণা করবে।

গোরিলাদের মধ্যে যাবার আগে ডিয়েনের মনে হল, ওরা

যেভাবে শব্দ-টব্দ করে মনের ভাব বুঝিয়ে দেয়, আগে সেটা শিখে ফেলা দরকার। ওদের ভাষাটা একটু সড়গড় হলে ডিয়েনকে ওরা আর শত্রু ভাববে না। ভাগ্যটা ভাল তাঁর। ইউরোপের কোনো চিড়িয়াখানার জন্যে বাচ্চা গোরিলা ধরতে গিয়েছিল কজন। ধরা পড়ে দুটো গোরিলা। কিন্তু বেচারারা ভীষণ আহত হয়েছিল। ডিয়েন তখন ওদের সেবা করতে এগিয়ে আসেন। এইসময় ওরা খিদে পেলে, ক্লান্ত হলে, রেগে গেলে, ঝগড়া করলে মুখ দিয়ে কীরকম আওয়াজ করে সেটা রপ্ত করে ফেলেন। ওরা উত্তেজিত হলে বা রেগে গেলে গরগর করে ওঠে। ভীষণ খুশি হলে ওরা ঢেকুর তোলার মতো শব্দ করে। ওরা 'নুম নুম নুম' বলে সমস্ত ব্যাপারটা তোফা জমেছে এটা বোঝায়। একবার একদল গোরিলা খাচ্ছে, তখন ডিয়েন হামা-গুড়ি দিয়ে অলক্ষ্যে তাদের মধ্যে ঢুকে পড়ে ঢেকুর তোলার মতো শব্দ করেন। তখন চারপাশ থেকে সব গোরিলা ঐ শব্দ করে বুঝিয়ে দেয় তারা চর্ব্যচোষ্য খাচ্ছে। ঘোঁত ঘোঁত করে শুয়োরের মতো শব্দ করে সাধারণত একজন পুরুষ গোরিলা ঝগড়াঝাটি থামায় কিংবা পাততাড়ি গুটিয়ে এগুবার আদেশ দেয়। মেয়েরা ঈষৎ মোলায়েম স্বরে ঘোঁত ঘোঁত করে বাচ্চাদের শাসন করে। পেঁচার মতো হুম হুম করে ডেকে ওরা বোঝায় যে, সামনে বিপদ, বা ব্যাপারটা ঠিক ভাল ঠেকছে না। ডিয়েন জঙ্গলে থাকতে এসব শব্দ প্রচুর টেপরেকর্ডে তুলেছেন।

ডিয়েন সবসুদ্ধ গোরিলাদের নটা দল নিয়ে গবেষণা চালিয়েছেন। কিন্তু চারটে দলকে দেখেছেন খুব কাছ থেকে। এক-একটা দলে পাঁচ থেকে উনিশটা গোরিলা থাকে—গড়ে দলপিছু তেরজন। দলে কজন আছে সেটা গুনে বুঝে নেন, কোন্ দল। প্রত্যেকটা গোরিলার হাবভাব দেখে তিনি ওদের একটা করে নাম দিয়েছেন। এর ফলে ওদের গতিবিধি সম্বন্ধে নজর রাখার সুবিধা হয়েছে।

এই নটা দলের দলপতি বা সর্দার একজন সাদাপিঠ গোরিলা। ওদের বয়স হলে পিঠের লোমগুলো পেকে সাদা হয়। সর্দারের ঠিক নীচে থাকে এক বা একাধিক সাদাপিঠ পুরুষ গোরিলা। এদের নীচে কমবয়সী কালোপিঠ যুবক গোরিলা আর মেয়েরা। এদের নীচে ছেলে-ছোকরা কাচ্চাবাচ্চার দল। এদের দেখতে-দেখতে ডিয়েন এরা কী খায় আর কেমন করে খায়, কোন্ এলাকায় ঘোরাফেরা করে, কীভাবে ঝগড়া আর খুনসুটি করে, খেলায় মাতে, তা শিখেছেন। দেখেছেন তিনি ওরা কেমন করে দুপুরবেলা একটু গড়িয়ে নেবার জন্যে ব্যবস্থা করে, আর রাতে শোবার জন্যে বাসা বানায়। বিছানা করে গাছের ডাল ভেঙে, তার ওপর শেওলা মাটি লেপে, পাতা বিছিয়ে নেয়। কখনো গাছের ওপরে। কখনো মাটিতে।

একদিন গোরিলারা ডিয়েনকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করল। পীনাট নামে একটা কালোপিঠ পুরুষ গোরিলা ডিয়েনের কাছে এগিয়ে এল। ভয় পাইয়ে দেবার জন্যে খুব জোরে জোরে বুক চাপড়াল গোরিলাটা। তারপর সটান এগিয়ে এল ডিয়েনের দিকে। নিজের গা খুব চুলকোলে গোরিলারা আশ্বস্ত হয়। ডিয়েন তাই খসখস আওয়াজ করে সারা গা চুলকোতে লাগলেন। পীনাট বোঝাতে চাইল, সেও বন্ধু। তাই সেও গা চুলকোতে শুরু করল। তখন ডিয়েন ওর দিকে একটা হাত এগিয়ে দিলেন। পীনাট একটু ইতস্তত করল। তারপর এক-সময় ডিয়েনের হাত ছুঁয়ে দিল। রবার্ট ক্যাম্বেল এই ঘটনার ফোটো তুলেছেন। কিন্তু তিনি এক সেকেণ্ড দেরি করে ফেলে-ছিলেন। তাই ডিয়েনের হাত যে-মুহূর্তে পীনাট স্পর্শ করল, সেই মুহূর্তটা চিরকালের জন্যে ফোটোতে ধরতে পারলেন না রবার্ট।

ডিয়েন ঘণ্টার পর ঘণ্টা বুনো গোরিলাদের মধ্যে কাটিয়েছেন। দিনের পর দিন। তাঁর অভিমত, জীবজন্তুর মধ্যে গোরিলা খুবই ভদ্রগোছের ব্যবহার করে। আর ভীষণ লাজুক। জীবমাত্রেরই মতো কেউ তাদের আক্রমণ করলে তারা আত্ম-রক্ষার জন্যে পালটা আক্রমণ করে। তাদের ছেলেমেয়েদের আক্রমণের হাত থেকে তারা বাঁচায়। তবে দুষ্টুমি করে সময়-বিশেষে। গায়ে যে ভীষণ জোর, সেটা মাঝে-মাঝে পরস্পরকে দেখায়।

একদিন ডিয়েন একটা গাছের ডালে বসে আছেন। ব্রাভেডো বলে একটা পুরুষ গোরিলা ওকে পাশ কাটিয়ে ওপরে উঠে গেল। নামবার সময় ব্রাভেডোর মনে হল, ডিয়েনের উচিত সরে গিয়ে ওকে পথ করে দেওয়া। ডিয়েনের কাঁধে আস্তে করে হাত রেখে মৃদু চাপ দিয়ে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল। কিন্তু ডিয়েন তখন স্থির করেছেন, সরবেন না। সরতে গেলে যদি পড়ে যান নীচে। ব্রাভেডো হাতের এক ধাক্কা মারলে ছিটকে পড়তেন ডিয়েন। সে আহত অভিমানে অন্য ডালে গিয়ে বুক চাপড়ে ডাল ভেঙে হুড়মুড় করে নামল। নীচে পড়ে সেই ডালের পাতা খেল।

গোরিলা মা বাচ্চা বুকে করে আশি ফুট উঁচু গাছে ফল পাড়তে ওঠে। বাচ্চাকে গলার কাছে রেখে তরতর করে ওঠে। বাচ্চারা দু হাতে মাকে আঁকড়ে ধরে। পঞ্চাশ ফুট ওঠার পর দেখা যায় বাচ্চাটা মায়ের কোমর পর্যন্ত নেমে এসেছে। তখন মা-রা বাচ্চাদের আবার গলার কাছে তুলে নেয়। নামার সময় গলা থেকে নামতে নামতে ক্রমশ মায়ের হাঁটুর কাছে বাচ্চারা নেমে যায় ঝাঁকুনির চোটে। কিন্তু ছিটকে পড়ে চোট লাগার ঘটনা দেখেননি ডিয়েন।

একদল গোরিলা অন্য দলের কাছাকাছি এলে পরস্পরকে ভয় দেখিয়ে দূরে সরে যায়। কিন্তু মারামারি করতে দেখেননি ডিয়েন। একটু বুক চাপড়ে চিৎকার করে তখন ওরা। দু-চারটে ডাল ভাঙে। হম্বিতম্বি করে। তারপর সরে যায়। একদিন ডিয়েন দেখেন একটা দুধের বাচ্চা বড়দের দেখাদেখি বুক চাপড়াচ্ছে আর ডালপালা ভাঙছে। বিরাট এলাকা জুড়ে ফল-পাকুড়ের খোঁজে ওরা ঘুরে বেড়ায় যাযাবরের মতো। ওরা একদল অন্য দলের কাছে এলেও বন্ধুত্ব করে না। বরং এড়িয়ে চলে। কার কী মতলব কে জানে! সুতরাং কী দরকার মেলা-মেশা করার!

ডিয়েন ফসি ওদের 'লোকগণনা' করেছেন। গবেষণা করেছেন। ওদের স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে জানা গেছে অনেক কিছু। নিশ্চিহ্ন হবার মুখে এসেছিল ওরা। তবে এখন ওদের বাঁচানো যাবে বোধহয়।

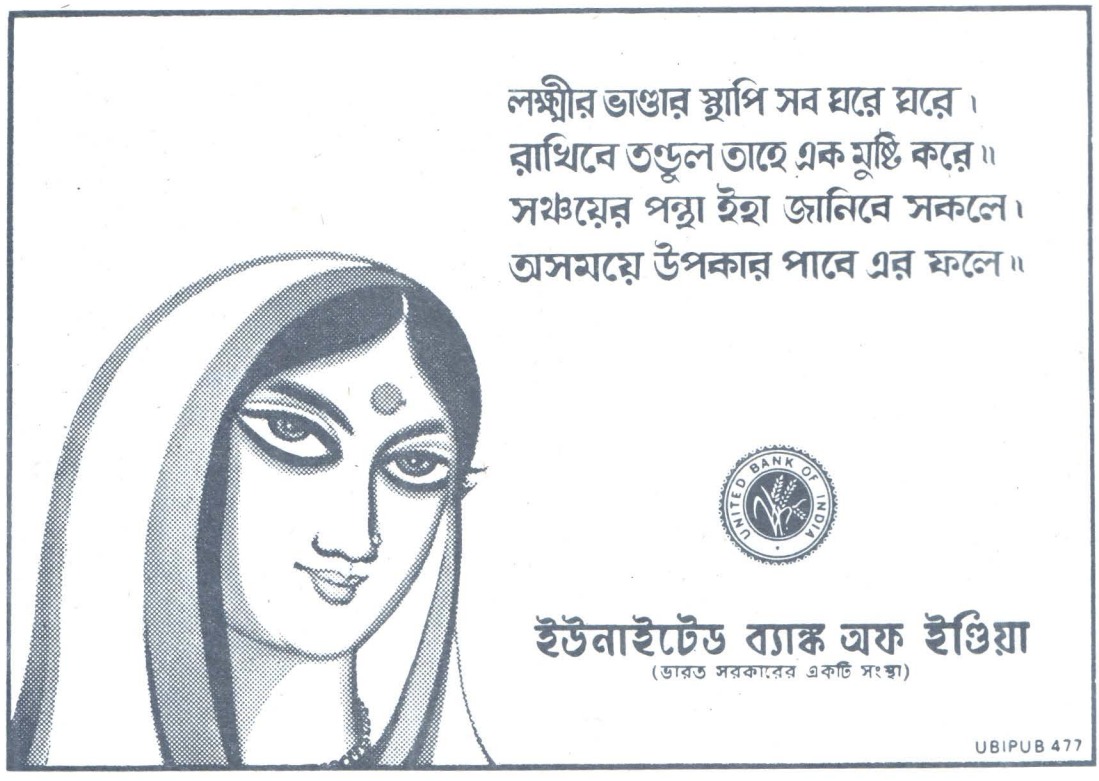

লালটেম

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

লালটেম কারো পরোয়া করে না। সে আছে বেশ। সকাল-বেলা সে তিনটে মোষ নিয়ে চরাতে বেরোয়। এ জায়গাটা ভারী সুন্দর। একদিকে বেঁটে-বেঁটে চা-বাগানের দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তার। অন্য ধারে বড় একটা মাঠ। মাঠের শেষে তিরতিরে একটা ঠাণ্ডা জলের পাহাড়ী নদী—তাতে সব সময়ে নুড়ি-পাথর গড়িয়ে চলে। নদীর ওপারে জঙ্গল। আর তার পরেই থমথম করে আকাশ-তক উঠে গেছে পাহাড়। সামনের পাহাড়গুলো কালচে সবুজ। দূরের পাহাড়গুলোর শুধু চূড়ার দিকটা দেখা যায়—সেগুলো সকালে সোনারঙের দেখায়, দুপুরে ঝকঝকে সাদা, আর সন্ধের মুখে মুখে ব্রোঞ্জের মতো কালোয় সোনায় রঙ ধরে থাকে। আর চারপাশে সারাদিন মেঘ বৃষ্টি রোদ আর হাওয়ার খেলা। গাছে-গাছে পাখি ডাকে, কাঠবেড়ালি গাছ বায়, নদীর ওপাশে সরল চোখের হরিণ অবাক হয়ে চারদিক দেখতে দেখতে আর থমকে-থমকে থেমে জল খেতে আসে।

লালটেম বেশ আছে। মোষ নিয়ে সে মাঠে গিয়ে ছেড়ে দেয়। এক জায়গায় বসে কোঁচড় থেকে মুড়ি খায়। নদীর জল খায়। তারপর খেলা করে। তার সঙ্গী-সাথী কিছু কম নেই। তারাও সব মোষ গরু বা ছাগল চরাতে আসে। যে যার জীবজন্তু মাঠে ছেড়ে দিয়ে চোর-চোর খেলে, ডাণ্ডাগুলি খেলে, নদীতে নেমে সাঁতরায়, আরো কত কী করে।

দুপুরের দিকে খুব খিদে পেলে বাড়ি ফিরে লালটেম খায়। কিন্তু সব দিন খাবার থাকে না। যেদিন থাকে না সেদিন লালটেম টের পায়। তাই সেদিন সে বাড়ি ফেরে না। দুপুরে সে গাছের পাকা ডুমুর কি আমলকী পেড়ে খায়। বেলের সময় বেল পাড়ে, কখনো বা টক আম বা বাতাবী লেবু পেয়ে যায় বছরের বিভিন্ন সময়ে। তাই খায়। খেয়ে সবচেয়ে বুড়ো আর শক্ত চেহারার মোষ মহারাজার পিঠে উঠে চিৎপাত হয়ে ঘুমোয়।

ছোট্টো ইস্টিশনটার গা ঘেঁষে লালটেমদের ঝোপড়া। তার বাবা পেতলের থালায় সাজিয়ে পেঁড়া বিক্রি করে ট্রেনের সময়ে। বাজারে বড় বড় কারবারীদের কাছে ভৈঁসা ঘি বেচে, দুধ দেয় বাড়ি-বাড়ি। তিনটে মোষের মধ্যে দুটো হচ্ছে মেয়ে মোষ। মহারাজা পুরুষ। দুটো মেয়ে-মোষই বছরের কোনো-না-কোনো সময়ে দুধ দেয়। বুড়ো মোষটার মরার সময় ঘনিয়ে এসেছে। আর দুটোও বুড়ো হতে চলল। সামনে দুর্দিন। লালটেমদের সংসার বেশ বড়। মা ঘুঁটে দিয়ে বিক্রি করে, বাবা দুধ, পেঁড়া, ঘি বেচে। এই করে কোনোরকমে দশ জনের সংসার চলে। লালটেমের দাদু আছে, আরো ছয় ভাই-বোন আছে! তারা কোনো লেখাপড়া শেখেনি, মাঝে-মাঝে মোষের দুধ, ঘি বা পেঁড়া ছাড়া কোনো ভাল খাবার খায়নি, খাটো ধুতি বা শাড়ি ছাড়া ভাল জামাকাপড়

পরেনি, তারা একসঙ্গে একশো টাকাও কখনো চোখে দেখেনি।

তবু লালটেম কারো পরোয়া করে না। দিনভর সে মোষ চরায়, সাথীদের সঙ্গে খেলা করে, আর চারদিককার আকাশ বাতাস আলো পাহাড় দেখে চমৎকার সময় কেটে যায়।

একদিন একটা রোগা মানুষ ওপার থেকে শীতের নদীর হাঁটুভর জল হেঁটে পার হয়ে এল। লোকটার গা ময়লা চাদরে ঢাকা, পরনে একটা পাজামা, কাঁধে মস্ত এক পুঁটুলি। লালটেম আর তার সাথীরা অবাক হয়ে লোকটাকে দেখছিল। কারণ, নদীর ওপারের জঙ্গলে বাঘ আছে, বুনো মোষ, দাঁতাল শুয়োর আর গণ্ডার আছে, সাপ তো কিলবিল করছে। ওদিকে কেউ যায় না, একমাত্র কাঠুরেরা ছাড়া। তারাও আবার দল বেঁধে যায়, সঙ্গে লাঠি থাকে, বল্লম থাকে, তীর-ধনুক থাকে, আর কুড়ুল তো আছেই।

লোকটা জল থেকে উঠেই পোঁটলাটা মাটিতে রেখে একগাল হেসে বলল, "একটা জিনিস দেখবে?"

"হ্যাঁ-অ্যা," লালটেমরা খুব রাজী।

লোকটা ধীরে আস্তে পুঁটুলির গিঁট খুলে চাদরটা মেলে দিল। লালটেমরা অবাক হয়ে দেখে, ভিতরে কয়েকটা ইঁট।

তারা সমস্বরে বলে ওঠে, "এ তো ইঁট!"

রোগা লোকটা হেসে বলল, "ইঁট ঠিকই, তবে সাধারণ ইঁট নয়। প্রায় দেড় হাজার বছরের পুরনো একটা রাজবাড়ির জিনিস। ঐ জঙ্গলের মধ্যে আমি সেই রাজবাড়ির খোঁজ পেয়েছি।"

রাজা বা রাজবাড়ি সম্পর্কে লালটেমের ধারণা খুব স্পষ্ট নয়। তবে সে জানে, একজন রাজা সোনার রুটি খেতেন। তাঁর রানী যে শাড়ি পরতেন সেটা জ্যোৎস্নার সুতো দিয়ে বোনা।

লোকটা ইঁটগুলোকে পুঁটুলিতে বেঁধে হাত ঝেড়ে বলল, "সেই রাজবাড়িটায় অনেক কিছু মাটির নীচে পোঁতা আছে। যে পাবে সে এক লাফে বড়লোক হয়ে যাবে। তবে কিনা সেখানে যখেরা পাহারা দেয়, সাপ ফণা ধরে আছে চারদিকে। যাওয়া শক্ত।"

লালটেম বলে, "তুমি তাহলে বড়লোক হলে না কেন?"

লোকটা অবাক হয়ে বলে, "আমি! আমি বড়লোক হয়ে কী করব? দুনিয়াতে আমার কেউ নেই। দিব্যি আছি, ঘুরে-ঘুরে সময় কেটে যায়। রাজবাড়িটা দেখতে পেয়ে আমি শুধু লোককে দেখানোর জন্য কয়েকটা ইঁট কুড়িয়ে এনেছি। এইতেই আমার আনন্দ।"

লালটেম বলে, "তোমাকে বাঘে ধরল না? সাপে কাটল না? বুনো মোষ তাড়া করল না?"

লোকটা ভালমানুষের মত বলে, "জানোয়াররাও বন্ধু আর শত্রু চিনতে পারে। আমি নিরীহ মানুষ, ওরাও সেটা টের পেয়েছিল। তাই কিছু বলেনি।"

লোকটা তারপর গান গাইতে-গাইতে মাঠ পেরিয়ে চলে গেল। লালটেম তার সাথীদের সঙ্গে খেলায় মেতে গেল।

পরদিন ভোরবেলায় কোদাল গাঁইতি হাতে কয়েকজন লোক নদীর ধারে এসে হাজির। তাদের মধ্যে একজন লোককে লালটেম চেনে। সে হল এ অঞ্চলের নামকরা গুণ্ডা আর জুয়াড়ি প্রাণধর। লালটেমকে ডেকে সে লোকটা বলল, "এই ছোঁড়া, ঐ জঙ্গলের মধ্যে যাওয়ার রাস্তা আছে?"

লালটেম ভালমানুষের মতো বলে, "কাঠুরেদের পায়ে-হাঁটা রাস্তা আছে।"

লোকটা কটমট করে চেয়ে বলে, "আমরা যে এদিকে এসেছি, খবর্দার কাউকে বলবি না!"

লোকগুলো হেঁটে শীতের নদী পার হয়ে ওপাশে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

লালটেমরা মুখ-তাকাতাকি করে নিজেদের মধ্যে খেলা শুরু করে দেয়। কিন্তু একটু বাদেই আবার কোদাল-শাবল হাতে একদল লোক আসে। তারাও জঙ্গলের মধ্যে পথ আছে কিনা জিজ্ঞেস করে, তারপর লালটেমরা যাতে আর কাউকে না বলে সে বিষয়ে সাবধান করে দিয়ে নদী পার হয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়ে।

সারাদিন যে এভাবে কত লোক জঙ্গলের মধ্যে গেল তার গোনাগুনতি নেই। তাদের মধ্যে কানা খোঁড়া, বুড়ো কচি, বড়লোক গরিব সবরকম আছে। চোরের মতো হাবভাব সবার। কী যেন গোপন করছে। এদের দলে লালটেম নিজের বাবাকেও দেখে ভারী অবাক হয়।

বাবা লালটেমকে দেখে কিছু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, "আমার ফিরতে দুদিন দেরি হবে। সাবধানে থেকো। মোষগুলোকে যত্নে রেখো। বাড়ি বাড়ি দুধ দিও, পেঁড়া বেচো, ঘি বিক্রি কোরো।"

বাবা গেল। কিছুক্ষণ পরে একদল ঘুঁটেউলির সঙ্গে মাকেও জঙ্গলে যেতে দেখল লালটেম।

মা কাছে এসে তাকে টেনে নিয়ে বলল, "আমার ফিরতে একটু দেরি হবে বাবা। একদিন বা দুদিন। তুমি সব সামলে রেখো।"

সেই রোগা লোকটা গ্রামে-গঞ্জে হাটে-বাজারে রাজবাড়ির কথা রটিয়ে দিয়ে গেছে। এখন তাই লোভী মানুষেরা চলেছে। সেই রাজবাড়ির খোঁজে। লালটেম তাই অবাক হলেও ব্যাপারটা বুঝতে পারল।

দুদিন গেল। তিনদিন গেল। লালটেম আর তার সাথীরা রোজ মোষ চরাতে আসে। এসে নদীর ধারে দাঁড়িয়ে ওপারে জঙ্গলের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সকলেরই বাপ মা, আপন-জনেরা জঙ্গলে গেছে। কেউই এখনো ফেরেনি।

দাঁড়িয়ে তারা একটু অপেক্ষা করে। তারপর আবার খেলায় মাতে। নদীতে স্নান করে। গাছে উঠে খাওয়ার যোগ্য ফলপাকুর খোঁজে। মোষের পিঠে শুয়ে থাকে।

চারদিনের দিন সন্ধেবেলা একটা লোক জঙ্গল থেকে টলতে-টলতে বেরিয়ে ঝপাং করে নদীতে পড়ল। পড়ে আর ওঠে না। লালটেমরা দৌড়ে গিয়ে জল থেকে টেনে তুলে তাকে এপারে নিয়ে আসে।

লোকটা প্রাণধরের এক স্যাঙাত। তার চোখ রক্তবর্ণ, পেটে পিঠে এক হয়ে গেছে খিদেয়, ভাল করে কথা বলতে পারছে না। লালটেম গিয়ে শালপাতায় নদীর জল তুলে এনে তাকে খাওয়ায়। তারপর মকাই ভাজা দেয়।

লোকটা একটু দম পেয়ে বলল, "সব মিথ্যে কথা। রাজবাড়ি কোথাও নেই। আমরা মাইলের পর মাইল হেঁটে খুঁজেছি। খাবার নেই, জল নেই। সাড়া পথে নানারকম বিপদ। আমার সঙ্গীরা কোথায় হারিয়ে গেছে।"

এইরকম ভাবে দু-চার দিন পরে পরে একটি-দুটি হা-ক্লান্ত লোক ফিরে এসে তাদের বিপদের কথা জানায়। তারা মিথ্যে মিথ্যে হয়রান হয়েছে। বহু লোক বাঘের পেটে গেছে। কিছু মরেছে বুনো হাতি, বুনো মোষ, দাঁতাল শুয়োরের পাল্লায় পড়ে। বহু লোককে সাপে কেটেছে। জঙ্গলে খাবার নেই, জল নেই, পথ নেই। সেখানে গোলকধাঁধার মতো ঘুরে মরতে হয়।

গা-ভর্তি জ্বর নিয়ে একদিন লালটেমের বাবা ফেরে। শরীর শুকিয়ে সিকিভাগ হয়ে গেছে। তার ওপর বিড়বিড় বকছে—রাজবাড়ি! সোনা-দানা! বাপ রে বাপ!

এর দুদিন বাদে ফিরল মা। লালটেম দেখল, তার মা এ কয়েকদিনেই খুনখুনে বুড়ি হয়ে গেছে। মাজা বেঁকে যাওয়ায় লাঠিতে ভর দিয়ে কুঁজো হয়ে হাঁটে, মাথার চুল পেকে শনের গুছি, গলার স্বরে একটা কাঁপ ধরেছে।

শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, একে-একে সবাই ফিরে এসেছে।

মরেনি কেউই। তবে সকলেরই ভীষণ বিপদ হয়েছিল। নানারকম বিপদ আর কষ্ট সহ্য করে মরতে-মরতে ফিরেছে। তবে মানুষগুলো আর আগের মতো নেই। যুবকরা বুড়ো হয়ে ফিরেছে, বুড়োরা অথর্ব হয়ে গেছে, আমুদে লোকেরা দুঃখী, দুঃখীরা পাথর হয়ে এসেছে। কোনো মানুষই আর আগের মতো নেই।

লালটেম আজকাল মোষ চরাতে চরাতে খুব রাজবাড়ির কথা ভাবে। তার খুব জানতে ইচ্ছে করে রাজবাড়ির জন্য লোকগুলো হন্যে হয়ে ছুটে গিয়েছিল কেন!

দুপুর গড়িয়ে গেছে। মোষ মহারাজার পিঠে গামছা পেতে চিত হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে ছিল লালটেম। বুড়ো মোষটা ঘাস খেতে-খেতে নদীর ধারে এল। তারপর লালটেমকে পিঠে নিয়ে নদীতে নামল জল খেতে। জল খেয়ে খুব ধীরে-ধীরে নদী পেরিয়ে জঙ্গলের দিকে চলতে লাগল।

লালটেম ঘুম থেকে উঠে হাঁ। এ সে কোথায়? মহারাজা তাকে পিঠে নিয়ে গভীর জঙ্গলের ভিতরে দাঁড়িয়ে আছে। দুপুর শেষ হয়ে রোদে বিকেলের নরম আভা লেগেছে। চারদিকে গভীর স্বরে পাখিরা ডাকছে। পাতা খসে পড়ছে গাছ থেকে। সরসর করে হাওয়া দিচ্ছে। আর চিকড়ি-মিকড়ি আলোছায়ায় সামনেই এক বিশাল বাড়ির ধ্বংসস্তূপ। ভেঙে-পড়া খিলান, গম্বুজ, পাথরের পরী, ফোয়ারা, শ্বেতপাথরের সিঁড়ি। বাড়ির চূড়ায় এখনো একটা সোনার কলস চিকমিক করছে।

লালটেম হাঁ করে চেয়ে আছে তো আছেই। মহারাজা ফোঁস করে একটা শ্বাস ছাড়তে সেই শব্দে লালটেম সচকিত হয়ে মাটিতে নামল লাফ দিয়ে। তাই তো! এই তো সেই রাজবাড়ি মনে হচ্ছে। এক পা দু পা করে লালটেম এগোয়।

চারদিকে শ্যাওলা ধরা পাথর আর ইঁটের স্তূপ। এই সেই ইঁট, যা রোগা লোকটা তাদের দেখিয়েছিল। সুতরাং এইটাই রাজবাড়ি। লালটেম দেখে, চারধারে নানা রঙের সাপ ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিছু সাপ ফণা তুলছে। ফোঁ ফোঁ করে ভয়ংকর শব্দ করছে তারা। কোত্থেকে একটা দুটো তক্ষক ডাকল। ছমছম করে ওঠে এখানকার নির্জনতা। লালটেম ভয় পায় বটে, কিন্তু তবু এগোয়। সাপেরা তার পথ থেকে সরে-সরে যায়।

চারদিকে ফিসফাস শব্দ ওঠে। কারা যেন হিঃ হিঃ করে হেসে ওঠে কাছেই। চারদিকে চেয়ে লালটেম কাউকে দেখতে পায় না। আবার এগোয়।

কী করুণ অবস্থা! বিশাল ঘরের আধখানা ভেঙে পড়ে গেছে, বাকি অর্ধেকটায় ধুলো জঞ্জাল আর আগাছা। মাকড়শার জাল এত ধারালো যে গায়ে লাগলে চামড়া চিড়ে যায়। কাঁকড়া-বিছেরা বাসা করে আছে যেখানে-সেখানে, একটা ঘরে শেয়ালের বাচ্চারা দলা পাকিয়ে ঘুমোচ্ছে, একটা জংধরা লোহার সিন্দুকের ওপর নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে একটা দাঁতাল শুয়োর।

একটার পর একটা ভাঙা ঘর পার হয় লালটেম। দেখে, অনেকগুলো বন্ধ কুঠুরি। কৌতূহলবশে সে একটা কুঠুরির দরজা ঠেলা দিতেই দরজাটা মড়াত করে ভেঙে পড়ে গেল। লালটেম ভিতরে ঢুকে ভীষণ অবাক হয়ে দেখে, সেখানে অনেক সোনা-রুপোর বাসন পাঁজা করে রাখা।

পাশের কুঠুরিতে ঢুকে লালটেম হাজার-হাজার মোহর দেখতে পেল। তার পাশেরটায় গয়না, হীরে, মুক্তো।

কত কী রয়েছে রাজবাড়িতে। দেখে লালটেম অবাক তো অবাক। সব কিছু সে ছুঁয়ে-ছুঁয়ে, নেড়েচেড়ে দেখে, তারপর আবার যেখানকার জিনিস সেখানেই রেখে দেয়।

সাতটা কুঠুরির সব-শেষটায় ঢুকে লালটেম দেখে ধুলোর ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে একটা মানুষের কঙ্কাল। ভীষণ ভয় পেয়ে লালটেম দরজার দিকে পিছু হটে সরে এল।

হঠাৎ কঙ্কালটা নড়ে উঠল। একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ করে

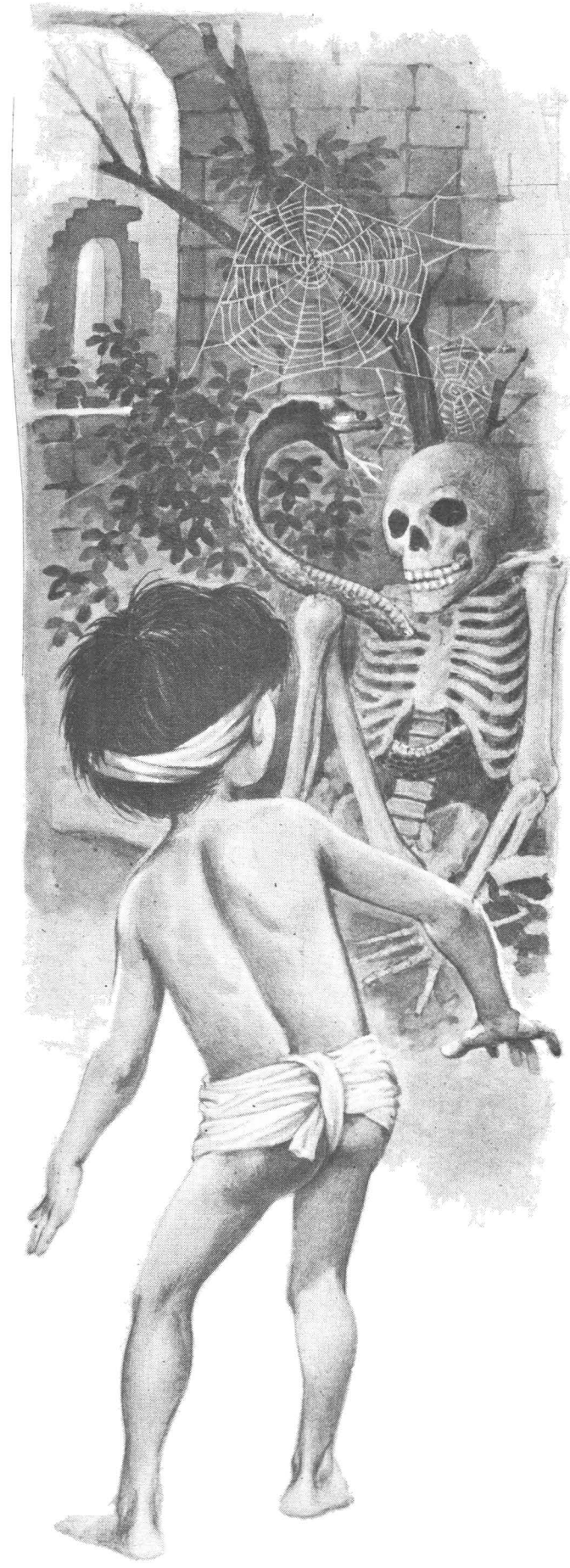

কঙ্কালটা বলল, "লালটেম, যেও না।"

লালটেম ভয় পেয়েও দাঁড়ায়।

এক বোঝা হাড় নিয়ে খটমট শব্দ করে আস্তে আস্তে কঙ্কালটা উঠে বসে। লালটেম দেখে, কঙ্কালটার পাঁজরের মধ্যে একটা কালো সাপ, মাথার খুলির ভিতর থেকে চোখ আর নাকের ফুটো দিয়ে কাঁকড়া বিছে বেরিয়ে আসছে, আর সারা গায়ে লাল পিঁপড়ে থিকথিক করছে।

কঙ্কালটা হাত তুলে বলে, "আমার দশা দেখেছ?"

"দেখছি।"

"ভয় পেও না। এখানে যা কিছু দেখছ, সব সোনাদানা মোহর, গয়না, এ সবই তোমার। নিয়ে যাও।"

লালটেম মাথা নেড়ে বলে, "নিয়ে কী হবে?"

"অভাব থাকবে না। খুব বড়লোক হয়ে যাবে। নাও।"

বাইরে থেকে গম্ভীর গলায় মহারাজা ডাকল 'হাংগা'।

লালটেম চমকে উঠে বলল, "আমার মোষটার জলতেষ্টা পেয়েছে। আমি যাই।"

"যেও না লালটেম। কিছু নিয়ে যাও।"

মহারাজা আবার ডাকে 'আঃ আঃ'।

লালটেম ছটফট করে বলে, "বেলা বয়ে যাচ্ছে। আমি যাই।"

"তোমার মোষগুলো বুড়ো হয়েছে লালটেম, একদিন মরবে। তখন বড় দুর্দিন হবে তোমাদের। এইবেলা বড়লোক হয়ে যাও।"

মহারাজা বাইরে ভীষণ দাপিয়ে চেঁচায় 'গাঁ...গাঁ'।

লালটেম একটু হেসে বলে, "আমার দিন খারাপ যায় না। বেশ আছি।"

কঙ্কালটা রেগে গিয়ে বলে, "গাঁ গঞ্জের হাজারো মানুষ যে রাজবাড়ি খুঁজে-খুঁজে হয়রান, সেই রাজবাড়ি পেয়েও তুমি বড়লোক হবে না?"

লালটেম একটু ভেবে বলে, "না, আমি তো বেশ আছি। চারদিকে কত আনন্দ! কত ফুর্তি!"

সাপটা ফোঁস করে কঙ্কালটার পাঁজরায় একটা ছোবল দিল। উঃ করে কঙ্কালটা পাঁজর চেপে ধরে বলল, "গত একশ বছর ধরে রোজ ছোবলাচ্ছে রে বাপ!...ইঃ, ঐ দেখ মাথায় ফের কাঁকড়াবিছেটা হুল দিল...কী যন্ত্রণা!...আচ্ছা লালটেম, বলো তো বোকা লোকগুলো রাজবাড়িটা খুঁজে পায় না কেন? তোমাদের এত কাছে, জঙ্গলের প্রায় ধার ঘেঁষেই তো রয়েছে, তবু খুঁজে পায় না কেন? আর যে দু-একজন খুঁজে পায় সেগুলো একদম তোমার মতোই আহাম্মক। লালটেম, লক্ষ্মী ছেলে, যদি একটা মোহরও দয়া করে নাও তবে আমি মুক্তি পেয়ে যাই। নেবে?"

বাইরে মহারাজা ভীষণ রেগে চেঁচায় 'গাঁ-আঁ'।

লালটেম মুখ ঘুরিয়ে নেয়। বলে, "নিলেই তো তোমার মতো দশা হবে।"

এই বলে লালটেম বেরিয়ে আসে গটগট করে। মহারাজা তাকে দেখে খুশি হয়ে কান লটপট করে, গা শোঁকে, পা দাপিয়ে আনন্দ জানায়।

পরদিন থেকে আবার লালটেম মোষ চরাতে যায়। সাথীদের সঙ্গে খেলে। পাহাড়, জঙ্গল, নদী, মাঠ, চা-বাগান দেখে তার ভারী আনন্দ হয়। রোদ আর আলো, মেঘ আর বৃষ্টি, বাতাস আর দিগন্ত তাকে কত আদর জানায় নানাভাবে।

কোনোদিন তার খাবার থাকে। কোনোদিন থাকে না। যেদিন খাবার জোটে না, সেদিন সে মহারাজার পিঠে শুয়ে-শুয়ে আকাশ দেখে। তার মনে হয়, সে বেশ আছে। খুব ভাল আছে। তার কোন দুঃখ নেই।

ছবি বিমল দাশ

ওরা তো আপনারই মুখ চেয়ে আছে

ছেলেমেয়ে যখন ছোট তখন থেকেই তাদের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সব বাবা-মাই চান। তাদের জন্য পদে পদে বাবা-মার কতনা স্নেহ, যত্ন, উৎকণ্ঠা। আদর-যত্নে ছেলে-মেয়ে মানুষ করাই কিন্তু শেষ কথা নয়। তার চেয়ে বড় কাজ তাদের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা আর সে দায়িত্ব আপনাদেরই। মেয়ের বিয়ে বা ছেলের উচ্চশিক্ষার জন্য প্রয়োজন টাকার। সেই টাকা আজ থেকেই আপনাকে সঞ্চয় করতে হবে। তবেই তো আপনার দায়-দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।

এর জন্য একটি চমৎকার সঞ্চয়-পরিকল্পনা আমাদের আছে। ৫০০০৲ ক্যাশ সার্টিফিকেট কিনলে ২৫ বছর পর আপনি পাবেন ৬০,২৮৫.৬০৲। এর চেয়ে ভালো সঞ্চয়-ব্যবস্থা আর কি হতে পারে?

নিজেকে বারবার জিজ্ঞাসা করুন, "ছেলেমেয়ের ভবিষ্যতের জন্য যতটা দরকার সবকিছু কি আমি করেছি?"

পূর্ণ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন:

ইউনাইটেড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস: ৭, রেড ক্রস প্লেস
কলিকাতা-৭০০০০১ ● টেলিফোন: ২৩-১৭৮৪ (৩টি লাইন)

॥ অথবা আমাদের যে কোন শাখা অফিস ॥

Progressive/UIB-15/75

॥ ২ ॥

জাকার্তায় নামার অল্প সময়ের মধ্যে এমন দুটি ঘটনা ঘটে গেল যা চিন্তা করলে আজও আমার বুক কেঁপে ওঠে। আজও আমি সবকিছু যেন স্পষ্ট চোখের সামনে দেখতে পাই। প্রথম ঘটনাটি হল, প্রথম ম্যাচেই আমাদের হেরে যাওয়া। কত আশা করে খেলতে গিয়েছি, আর গিয়েই হেরে গেলাম! হেরে যাওয়ার দুঃখ সামলাতে না সামলাতেই আর এক আঘাত। এ আঘাত অবশ্য শুধু আমাদের ফুটবল দলটির ওপর নয়, সমস্ত ভারতীয় প্রতিযোগীরই ওপর। অমন সুন্দর দেশ ইন্দোনেশিয়া, কোথায় সবকিছু ঘুরে ঘুরে দেখব, তা না, ধরতে গেলে চোরের মত পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে লাগলাম আমরা। সে-সব কথায় একটু পরেই আসছি।

দ্বীপময় দেশ ইন্দোনেশিয়া। তার চোখ-জুড়ানো প্রাকৃতিক শোভা অবশ্য আগেও দেখেছি। ১৯৫৬ সালে গিয়েছিলাম মোহনবাগান ক্লাবের সঙ্গে। ১৯৬০ সালে প্রাক-অলিম্পিক ফুটবল খেলতে। তখনই শুনেছিলাম জাকার্তা কথাটির অর্থ হল —জয় সম্পূর্ণ করা। বিমানবন্দর থেকে গেমস ভিলেজে যাওয়ার পথে শহরটিও যেন আমাদের মন জয় করে নিল। চতুর্থ এশিয়ান গেমসের অতিথিদের অভ্যর্থনার জন্য জাকার্তা অপরূপ সাজে সেজে বসে আছে।

চোখ জুড়িয়ে গেল গেমস ভিলেজ আর প্রধান স্টেডিয়ামটি দেখে। এক লাখ দশ হাজার মানুষ বসে খেলা দেখতে পারে— এমন একটি বিরাট ত্রিতল স্টেডিয়াম। উপরে কাঁচের আচ্ছাদন। সোভিয়েট রাশিয়ার তৈরি স্টেডিয়ামটির স্থাপত্য শিল্পও দেখার মতো। আমি আগে এবং পরে বহু দেশেই খেলেছি। রোম অলিম্পিকে খেলে এসেছি। তার দু'বছর আগে খেলেছি টোকিও এশিয়ান গেমসে। কিন্তু অত বড় স্টেডিয়ামে আর খেলিনি।

কিন্তু, আগেই বলেছি, ওই স্টেডিয়ামে প্রথম খেলাতেই ঘটল আমাদের বিপর্যয়। দক্ষিণ কোরিয়ার কাছে হেরে গেলাম ০—২ গোলে। দল আমাদের খুবই শক্তিশালী ছিল। সেই দল গ্রুপের প্রথম ম্যাচে হারবে, এটা ছিল একেবারেই অপ্রত্যাশিত। আরও ভালভাবে বুঝলাম, ফুটবলে এশিয়া ধাপে ধাপে কত এগিয়ে গেছে।

'বি' গ্রুপে আমাদের বাকি দুটি খেলা ছিল তাইল্যান্ড ও জাপানের সঙ্গে। 'এ' গ্রুপের চারটি দল ছিল—ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া ও ফিলিপিনস। পরের ম্যাচে যদি তাই-ল্যান্ডকে হারাতে না পারি তবে গ্রুপ থেকেই আমাদের বিদায় নিতে হবে, এমন অবস্থার সৃষ্টি হল। আমার উদ্বেগের সীমা ছিল না। অনেক ভেবেচিন্তে এবং সিনিয়র খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরামর্শ করে দল অদলবদলের যে সিদ্ধান্ত নিলাম তা কোচ রহিম সাহেবের মনঃপূত হল না। খেলোয়াড় জীবনে ওই ধরনের পরিস্থিতির মধ্যে আর কখনও আমাকে পড়তে হয়নি।

ব্যাপারটা খুলেই বলছি। প্রথম ম্যাচে হায়দরাবাদের আফজল ছিল উইথড্রয়াল সেন্টার ফরোয়ার্ড। এখন তো সেন্টার ফরোয়ার্ড কথাটাই উঠে গেছে। চার ফরোয়ার্ডের খেলায় মাঝের দু'জনকে বলা হয় স্ট্রাইকার। আগে পাঁচ ফরোয়ার্ডের মাঝের জনকেই বলা হত সেন্টার ফরোয়ার্ড। সে এগিয়েই থাকত। গোল করাই ছিল তার প্রধান কাজ। দুইজন এগিয়ে পিছিয়ে খেলত। যে সেন্টার ফরোয়ার্ড শুধু এগিয়ে না থেকে পিছিয়ে এসেও খেলত তাকে বলা হত উইথড্রয়াল সেন্টার ফরোয়ার্ড।

যাই হোক, পি কে, আমি ও বলরামের মত ফাস্ট ফরোয়ার্ড-দের সঙ্গে তাল রেখে খেলার পক্ষে আফজল ছিল খুবই স্লো। দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে খেলায় সেটা ভালভাবেই প্রমাণ হয়ে গিয়েছিল। তাই ঠিক করলাম, আমি ও বলরাম খেলব স্ট্রাইকার হিসাবে। অরুময় খেলবে লেফট আউটে এবং আফজলের বদলে

খেলতে খেলতে

চুনী গোস্বামী

উইথড্রয়াল সেন্টার ফরোয়ার্ডে খেলবে হায়দরাবাদের আর এক খেলোয়াড় ইউসুফ খাঁ।

রহিম সাহেব আমার প্রস্তাবে সায় দিলেন না। একে কোচ, তার উপর ফুটবল সম্পর্কে তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান। আফজলের প্রতি তাঁর কোনো মোহ ছিল, একথা বলছি না। হয়ত তিনি অন্যভাবে আক্রমণের পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু আমার মন বলছিল, আফজলকে আবার দলে রাখলে আমাদের আক্রমণের ধার ভোঁতা হয়ে যাবে। রহিম সাহেব আমার প্রস্তাব নিচ্ছেন না দেখে আমরা বেশ বিচলিত হয়ে উঠেছিলাম। আমার বয়স তখন মাত্র ২৪ বছর। কোচের কথা অমান্য করার অর্থ ধৃষ্টতা দেখানো। যথেষ্ট বিনয়ের সঙ্গে তাঁকে বললাম, "রহিম সাহেব, আমি যে দল গড়েছি এই দলকে খেলতে দিন। কথা দিচ্ছি আমরা জিতবই।" শেষ পর্যন্ত তিনি রাগ-রাগ মুখ করে রাজী হয়ে গেলেন। আমরা চমৎকার যোগাযোগ রেখে খেলে তাইল্যান্ডকে হারালাম ৪—১ গোলে। চারটি গোলের মধ্যে পি কে-র ছিল দুটি, বল-রামের একটি, একটি আমার। ওই জয়ের ফলে আমাদের আত্ম-বিশ্বাস বেড়ে গেল। 'বলো বলো বলো সবে' গান মুখে করে আমরা গেমস ভিলেজে ফিরে এলাম। গ্রুপের পরের ম্যাচ জাপানের সঙ্গে।

ইতিমধ্যে প্রচণ্ড আঘাত এল এশিয়ান গেমসের উপর। আঘাত এল ভারতীয় প্রতিযোগীদের মনের উপরেও। সে ঘটনা অনেকেরই জানা আছে। তোমরা যারা ছোট, তারাও হয়ত কেউ কেউ জানো।

ব্যাপারটা হচ্ছে, ইন্দোনেশিয়া সরকার রাজনৈতিক কারণে তাইওয়ান ও ইজরায়েলের প্রতিযোগীদের ভিসা মঞ্জুর না করায় ওই দুটি দেশ প্রতিবাদ জানায় আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি ও এশিয়ান গেমস ফেডারেশনের কাছে। আন্তর্জাতিক খেলা-ধুলোর নিয়ম অনুসারে কিন্তু ইন্দোনেশিয়া সরকারের ভিসা মঞ্জুর করার কথা ছিল। অলিম্পিক খেলাধুলোই হোক, আর

এশিয়ান গেমসই হোক, যে-সব দেশ অলিম্পিকস সংস্থা বা এশিয়ান গেমস ফেডারেশনের সদস্য তাদের প্রতিযোগীদের দেশে প্রবেশ করতে দেওয়া আয়োজনকারী দেশের পক্ষে বাধ্যতামূলক। কিন্তু তাইওয়ান ও ইজরায়েলের প্রতিযোগীরা জাকার্তায় ঢুকতে না পারায় এশিয়ান গেমস শুরু হওয়ার আগে থেকে গোলমাল দানা বেঁধে উঠেছিল। গেমসের উদ্বোধন হয়েছিল আগস্টের ২৪ তারিখে। তারপর থেকে ওখানেই ঘন-ঘন বৈঠক বসছিল এশিয়ান গেমস ফেডারেশনের। ফেডারেশনের সব কর্মকর্তাই ওখানে উপস্থিত ছিলেন। ইতিমধ্যে কয়েকটি আন্তর্জাতিক ক্রীড়া ফেডারেশন এশিয়ান গেমস থেকে তাদের স্বীকৃতি তুলে নেয়। ওয়েটলিফটিং ফেডারেশন বলেছিল, তাইওয়ান ও ইজরায়েলের ভারোত্তোলকদের যদি প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে না দেওয়া হয়, "তোমাদের ওখানকার কোনো রেকর্ড আমরা মেনে নেব না। তোমাদের ভার তোলার খেলা ছেলেখেলা হিসাবে গণ্য হবে।" আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিক সংস্থাও ওই ধরনের কথা বলেছিল। সবচেয়ে বড় কথা, একই কারণে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটিও সমর্থন তুলে নিয়েছিল। তখন গেমসকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এবং খেলাধুলোর নীতির স্বার্থে জি ডি সোন্ধি ফেডারেশনের সভায় প্রস্তাব তুললেন, 'চতুর্থ এশিয়ান গেমস' কথাটি বাদ দিয়ে শুধু জাকার্তা গেমস নামে খেলাধুলো চালানো হোক। প্রস্তাবটি পাশও হয়ে গেল। আর তাতেই ইন্দোনেশিয়ার মানুষ খেপে গেল সোন্ধি এবং ভারতীয়দের উপরে। কারণ সোন্ধি ছিলেন ভারতবাসী। এশিয়ান গেমস ফেডারেশনের সহ-সভাপতি এবং আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির ভারতীয় প্রতিনিধি। পুরো নাম ছিল গুরু দত্ত সোন্ধি। বিদ্বান এবং অলিম্পিক আদর্শের পূজারী ছিলেন তিনি। দিল্লির তালকোটরা গার্ডেনের নাম হয়ত তোমরা শুনে থাকবে। সোন্ধিই ওই গার্ডেনের পরিকল্পনা করেছিলেন। আগে ছিলেন এক কলেজের অধ্যক্ষ।

যেহেতু সোন্ধি 'চতুর্থ এশিয়ান গেমস' কথাটি তুলে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং তিনি ছিলেন ভারতীয়, সেহেতু তাঁর ও আমাদের বিরুদ্ধে আরম্ভ হল ধিক্কার ধ্বনি। সোন্ধিকে হাতে পেলে জাকার্তার মানুষ ছিঁড়ে খাবে এমন অবস্থা। ভারতীয় দূতাবাসের উপর হামলা হল। এখানে ওখানে বড়-বড় পোস্টার পড়ল, তাতে বড়-বড় হরফে লেখা—"গো ব্যাক সোন্ধিজ মেন"।

আমরা পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলাম। ভিলেজ থেকে স্টেডিয়ামে যাওয়ার জন্য যে ডিলুক্স বাসটি আমাদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল, তার চিহ্ন মুছে ফেলা হল। অর্থাৎ বাসের গা থেকে মুছে ফেলা হল 'ভারতীয় দল' কথাটি। এমন কী শিখ খেলোয়াড় জারনেল সিংকে তার মাথায় পাগড়ি বাঁধতে বারণ করে দেওয়া হল, যাতে ভারতীয় বলে আমাদের কেউ চিনতে না পারে। কী নিষ্ঠুর পরিহাস বলো তো! আমরা সবাই পাগড়ি পরেই মার্চপাস্টে যোগ দিয়েছিলাম, এবং জারনেলই সবার মাথায় সুন্দর করে পাগড়ি বেঁধে দিয়েছিল। অবস্থার ফেরে তার নিজের মাথার পাগড়িই খুলে ফেলতে হল। কীভাবে আমাদের দিন কাটছিল হয়তো আন্দাজ করতে পারবে।

খেলার কথা লিখতে বসে এসব ঘটনার কথা এইজন্যই লিখতে হচ্ছে যে, খেলার মাঠ আনন্দের জায়গা, শিক্ষার জায়গাও বটে। আচার-আচরণ, নিয়মনিষ্ঠা, প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক রেখে সংগ্রাম করা, খেলোয়াড়সুলভ মনোভাবের পরিচয় দেওয়া ইত্যাদি সদ্‌গুণ খেলার মাঠে আমরা শিখে থাকি। কিন্তু খেলার মাঠেই সময়-সময় এমন ঘটনা ঘটে যায় যা আনন্দের বদলে মানুষকে দুঃখ দেয় বেশি।

আমাদের অ্যাথলিট, বক্সার এবং কুস্তিগীররা মাঝে মাঝেই কিন্তু সোনা-রুপো-ব্রোঞ্জ পদক জিতছিল। শেষ পর্যন্ত আমাদের সামগ্রিক ফলও হয়েছিল অনেক ভাল। আগেরবার টোকিও এশিয়ান গেমসে যেখানে আমরা পেয়েছিলাম পাঁচটি সোনা, চারটি রুপো ও তিনটি ব্রোঞ্জের মেডেল, সেখানে জাকার্তায় পেয়েছিলাম এগারোটি সোনা, তেরোটি রুপো ও দশটি ব্রোঞ্জের মেডেল। তবু জাকার্তা বাসের ওই দিনগুলি আমাদের কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছিল।

আবার ওই জাকার্তাতেই আমার জীবনে এমন এক ঘটনা ঘটেছিল, যা থেকে তোমরা বুঝতে পারবে খেলার পরিবেশ কত আনন্দময়।

সেটা ১৯৬০-এর প্রাক-অলিম্পিক ফুটবল খেলার সময়ের কথা। ওই জাকার্তায় ইন্দোনেশিয়াকে আমরা ২—০ গোলে হারাবার পরে টাউন হলের ভোজসভায় তখনকার প্রেসিডেন্ট ডঃ সুকর্ণ চমৎকার এক বক্তৃতায় বললেন, "ভারতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অত্যন্ত মধুর। এখনই নাচ শুরু হবে। আমি আশা করব, আমাদের ভারতীয় বন্ধুরা এই নাচে যোগ দিয়ে আমাদের আনন্দ দেবেন।"

শুরু হয়ে গেল নাচ। সে নাচে যোগ দিয়েছিলেন অনেক সুন্দরী মহিলা, কয়েকজন চিত্রতারকাও ছিলেন। কিন্তু আমাদের কেউ নাচা তো দূরের কথা, চেয়ার ছেড়েই উঠল না। আমি তখন ভাবলাম, ভারতবর্ষের নাচের এত নাম—কথাকলি, মণিপুরীর কত কদর—আমরা এসেছি উদয়শঙ্কর ও গোপীকৃষ্ণের দেশ থেকে, এভাবে বসে থাকলে লোকে ভাববে কী! আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লাম। নাচ শুরু করলাম একটি মেয়ের সঙ্গে। একটু পরেই চাপা হাসি, পরে তুমুল হাসির রোল উঠল। কী ব্যাপার ওভাবে সবাই হাসছে কেন? প্রথমে ভেবেছিলাম, বোধ হয় তারিফ পাচ্ছি। একটু পরেই বুঝতে পারলাম, আমার উদ্ভট নাচই সবার

জাকার্তা থেকে ফেরার পরে বিজয়ী ভারতীয় ফুটবল দল

হাসির কারণ। আমার নাচের তাল তো ঠিক ছিলই না, উপরন্তু মেয়েটি নাচতে নাচতে যেদিকে যাচ্ছিল আমি যাচ্ছিলাম ঠিক তার উলটো দিকে। আমার নাচের বহর দেখে মেয়েটি নাচ বন্ধ করে আমার দিকে চেয়ে মিট মিট করে হাসতে লাগল। তার হাসিই বলে দিচ্ছিল, আমি একেবারে আনাড়ি। টাউন হলের ভোজ-সভায় চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়র সঙ্গে ওই নাচ নিয়ে কত টিকা-টিপ্পনী, রঙ্গ তামাশা। কেউ কেউ আমার ওই বেতাল নৃত্যের নামকরণ করল 'চুনী-নৃত্য'। দু'বছর আগের এই মধুর ঘটনাটির কথা বার বার মনে পড়ছিল জাকার্তার মানুষ আমাদের উপর মারমুখী হওয়ায়।

কিন্তু ভেঙে পড়লে তো চলবে না। আবার দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে আমরা পরের ম্যাচের জন্য তৈরি হলাম। আগেই বলেছি, 'বি' গ্রুপে আমাদের পরের প্রতি-দ্বন্দ্বী ছিল জাপান। উদিত সূর্যের দেশ জাপানের সব কিছুতেই সংগ্রামী শক্তির পরিচয়। সংগ্রাম করেওছিল শেষ পর্যন্ত। তবু আমরা জিতেছিলাম ২—০ গোলে। গোলকীপার পি বর্মণ সেদিন খুব ভাল খেলেছিলেন। গোল করেছিলেন পি কে এবং বলরাম।

এবার সেমিফাইনাল খেলা দক্ষিণ ভিয়েতনামের সঙ্গে। তখনো আমাদের বিরুদ্ধে সমানে বিক্ষোভ চলছে। অ্যাথলেটিকস বক্সিং, কুস্তি প্রতিযোগিতায় আমাদের প্রতিযোগীদের বিদ্রূপ করা হচ্ছে, দুয়ো দেওয়া হচ্ছে, হেরে গেলে করা হচ্ছে উপহাস।

ইতিমধ্যে 'বলো বলো বলো সবে'-র বদলে আমাদের বুলি হয়ে উঠেছে—'গোল্ড মেডেল আউর জাকার্তা।' বুলি নয় গান। কোরাসের প্রথম কলি। ওটি রচনা করেছিলেন জাকার্তায় আমাদের প্রথম স্বর্ণপদকজয়ী কুস্তিগীর মালোয়া।

দক্ষিণ ভিয়েতনামের সঙ্গে সেমিফাইনাল আমার জীবনের এক স্মরণীয় খেলা। পুরো ৯০ মিনিট ধরে রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনার খেলায় আমরা জিতেছিলাম ৩—২ গোলে। আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণের ঢেউয়ে ভাঙাগড়ার সে এক রোমাঞ্চকর খেলা। প্রথমে আমি গোল করে দলকে ১—০ এগিয়ে রাখলাম। ওরা গোল শোধ করে দিয়ে আবার একটি গোল করে ২—১-এ এগিয়ে গেল। এবার গোলটি শোধ করে দিল জারনেল সিং। ২—২ গোলে সমান অবস্থার পর আমরা মরিয়া হয়ে উঠেছি। ভিয়েতনামও গোল দেওয়ার জন্য পাগল হয়ে খেলছে। যে-কোন দল জিততে পারে, যে-কোনো দল হারতে পারে—এমন অবস্থা। শেষ পর্যন্ত আমিই গোল করলাম। পৌঁছে গেলাম আমরা ফাইনালে। সেদিন জয়সূচক গোলসমেত দুটি গোল করেছিলাম বলেই নয়, কিংবা ওই পরি-বেশের মধ্যেও প্রচুর দর্শকের তারিফ পেয়েছিলাম বলেও নয়—সেদিন সত্যিই আমি খুশি হয়েছিলাম নিজের খেলায়। তাই বলেছি, ওটি ছিল আমার জীবনের এক স্মরণীয় খেলা।

জাকার্তা স্টেডিয়াম আকাশ থেকে

অত ভাল খেলার পরেও কিন্তু স্বর্ণপদক জয় সম্পর্কে সংশয় ছিল যথেষ্ট। কারণ যে দক্ষিণ কোরিয়ার কাছে গ্রুপের প্রথম ম্যাচেই আমরা হেরে গিয়েছিলাম সেই কোরিয়া দল ফাইনালে উঠল অপর সেমিফাইনালে মালয়েশিয়াকে পরাজিত করে। তবে কেউ কেউ বললেন, সোনা না পেলেও ফাইনালে যখন উঠেছি রুপো তো পাবই। বাধা দিয়ে বললাম, "কেন? মালোয়ার গান তোমরা মনে করতে পারছ না?" বলেই গেয়ে উঠলাম, 'গোল্ড মেডেল আউর জাকার্তা।' গলা মেলাল দলের সবাই।

আমরা কিন্তু মনের দিক দিয়ে প্রচণ্ড ধাক্কা খেলাম ফাইনালের

আগের দিন হকি ফাইনালে আমাদের দল ০—২ গোলে পাকিস্তানের কাছে হেরে যাওয়ায়। এক সময় আমরা ছিলাম বিশ্ব হকির অজেয় যোদ্ধা। টোকিও এশিয়ান গেমসে, রোম অলিম্পিকসে এবং ওখানে পাকিস্তানের কাছে ভারতের সেই হকি দলের হেরে যাওয়ার ঘটনায় আমাদের ক্যাম্পে শ্মশানের স্তব্ধতা নেমে এসেছিল। শ্যেফ দ্য মিশন সুরজিৎ সিং মাঝিথিয়ার চোখেও দেখেছিলাম দু'ফোটা জল—যেন দুটি গোলের প্রতীক।

হকি দলের শুধু হেরে যাওয়াই নয়, অধিনায়ক চরণজিৎ সিং ওই খেলায় বিশ্রীভাবে আহত হয়েছিলেন। ওদিকে আবার ফুটবলার জারনেল সিং আঘাত পেয়েছিলেন ভিয়েতনামের সঙ্গে সেমিফাইনাল খেলায়। কপালের খানিকটা জায়গায় বেশ একটু গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল। ইতিমধ্যে জি ডি সোন্ধি জাকার্তা থেকে উড়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। আমরা আবার সমস্যায় পড়লাম ফাইনালের দল গড়া নিয়ে। আমাদের অজান্তেই একটির পর একটি সমস্যা দানা বেঁধে উঠছিল। অপরদিকে দক্ষিণ কোরিয়ার মনোবল ছিল অটুট।

এক নম্বর গোলকীপার থঙ্গরাজ ফ্লুতে আক্রান্ত হওয়ায় আগের কোনো ম্যাচেই খেলতে পারেননি। তার জায়গায় পি বর্মণ অবশ্য ভালই খেলেছিলেন। এখন প্রশ্ন দাঁড়াল, ফাইনালে কে খেলবে। থঙ্গরাজ? না, পি বর্মণ? প্রশ্ন দেখা দিল, কপালে চোট-লাগা খেলোয়াড় জারনেল সিংকে স্টপারে খেলানো হবে কিনা। কেননা ওই পজিশনে বলে হেড করতেই হয়, এবং হেড করা ওই পজিশনের খেলোয়াড়ের অপরিহার্য দায়িত্ব। দীর্ঘ দিন ফ্লু-তে ভোগায় থঙ্গরাজ তখনো দুর্বল। অরুময় এবং আফজলকে নিয়ে তখনো আমাদের সমস্যা। মনে রাখতে হবে, সে সময় খেলোয়াড় বদলের নিয়ম ছিল না। সুযোগ ছিল না, খেলার সময় একজনকে বসিয়ে আর একজনকে খেলানোর।

সবাই মিলে ভেবেচিন্তেও কিছুই ঠিক করতে পারছিলাম না। হঠাৎ মাথায় এক বুদ্ধি খেলে গেল। অরুণ ঘোষ তখন লেফট ব্যাক এবং স্টপার দুই পজিশনেই সমান দক্ষ। হেডওয়ার্ক দারুণ ভাল। ঠিক হল, এবং রহিম সাহেবও তাতে সায় দিলেন যে, কপালে যা থাকে থাকুক, পুরো শক্তির দল নিয়েই আমরা মাঠে নামব। থঙ্গরাজ খেলবে গোলে, জারনেলের বদলে অরুণ হবে স্টপার, বলরাম লেফট আউটে আর জারনেল খেলবে তার সম্পূর্ণ অনভ্যস্থ স্থান সেন্টার ফরোয়ার্ডে।

নানাদিক ভেবে ওই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। জারনেলের স্টেপিং ছিল খুব ভাল। ড্যাশও চমৎকার। দুপায়ে জোরালো শট তো ছিলই। ফাইনালে আমাদের পুরো দলটি ছিল এই রকমঃ থঙ্গরাজ; চন্দ্রশেখর, অরুণ ঘোষ ও ত্রিলোক সিং; ফ্রাঙ্কো ও পি সিংহ; পি কে ব্যানার্জী, ইউসুফ খাঁ, জারনেল সিং, চুনী গোস্বামী ও বলরাম।

পরের ঘটনা তো আজ ইতিহাস। দর্শক-ঠাসা ওই বিশাল 'ইকাদা' স্টেডিয়ামে খেলা হয়েছিল সেপটেম্বরের ৪ তারিখে, অর্থাৎ ১২ দিনব্যাপী এশিয়ান গেমসের শেষদিনে। সেদিন আর কোনো ইভেন্ট ছিল না। তাই ফুটবল ফাইনাল দেখতে দর্শক উপচে পড়েছিল স্টেডিয়ামে।

আমরা দর্শকদের বিদ্রূপ ও টিটকিরির মধ্যে দক্ষিণ কোরিয়াকে ২—১ গোলে হারিয়ে স্বর্ণপদক জিতেছিলাম। ১৭ মিনিটে বলরাম বল দিল আমাকে, চকিতে দেহের দোলায় একজন প্রতিপক্ষকে কাটিয়ে আমি বল ঠেললাম পি কে-র পায়ে। পি কে-র সুতীব্র শটের কোন হদিস পেল না কোরিয়ার গোলকীপার। ১—০ গোলে আমরা এগিয়ে গেলাম। তিন মিনিট পরে ফ্রাঙ্কোর ফ্রি কিক জারনেলের পায়ে পড়তেই পর-পর দুজনকে ধোঁকা দিয়ে সে দু স্টেপ এগিয়ে গেল। তারপর বাঁ পায়ের এক জোরালো শট। কোরিয়ার গোলরক্ষক দ্বিতীয়বার পরাস্ত হলেন। খেলার ফল ২—০। দক্ষিণ কোরিয়া অবশ্য শেষ পর্যন্ত লড়েছিল। খেলা শেষ হবার পাঁচ মিনিট আগে একটি গোলও শোধ করেছিল, যদিও আমার ধারণা, চ্যা নামের কোরীয় খেলোয়াড়ের শটটি থঙ্গরাজের আটকানো উচিত ছিল। খেলার শেষ বাঁশি বাজতেই আমরা প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে সেই গান শুরু করলাম—"বলো বলো বলো সবে.....।"

সবে বিজয়মঞ্চে উঠেছি, আকাশে উড়ছে আমাদের জাতীয় পতাকা। আমাদের জাতীয় সঙ্গীতও শুরু হয়ে গেছে, হঠাৎ দেখি স্টেডিয়ামের এক জায়গায় দারুণ কোলাহল। কী ব্যাপার? না, আমাদের জাতীয় সঙ্গীত চলার সময় দুজন ইন্দোনেশীয় যুবক আসন থেকে উঠে দাঁড়ায়নি। আসনে বসে টিটকিরি দিচ্ছিল সমানে, তাই ওখানে উপস্থিত আমাদের ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন মেজর জেনারেল এবং একজন ব্রিগেডিয়ার ওই বসে-থাকা দুই যুবকের জামার কলায় ধরে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। তাই নিয়ে হৈ-চৈ। সেদিন আমাদের সামরিক অফিসারদের সাহস ও দেশাত্মবোধের পরিচয় পেয়ে আমরা খুব গর্ব বোধ করেছিলাম।

সোনার পদক গলায় পরে আমরা গেয়ে উঠলাম "গোল্ড মেডেল আউর জাকার্তা।" ওই পদক পরে যেদিন ফিরে এলাম দমদম বিমানবন্দরে, সে কী অভ্যর্থনা আমাদের! ভালবাসার বন্যায় আমি অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। নানা ঘটনা ও প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে জিতেছিলাম বলে নতুন করে জয়ের আনন্দ উপভোগ করেছিলাম প্রবলভাবে। ভাবছিলাম, অনেক কথা ভাবছিলাম সেদিন একইসঙ্গে। ভাবছিলাম, কেমন করে আমি খেলার মাঠে এলাম! কোথা থেকে এলাম! একটি সাধারণ ছেলেকে কে চুনী গোস্বামীতে রূপান্তরিত করল!

(ক্রমশ)

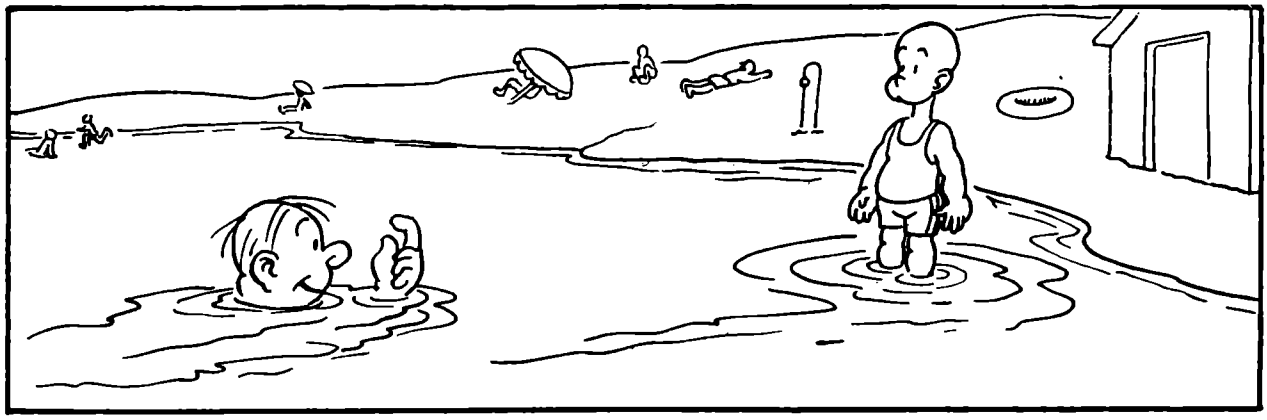

বুঝলে খোকা জলে ভাসার কায়দা
শেখা চাট্টি খানি ব্যাপার নয়

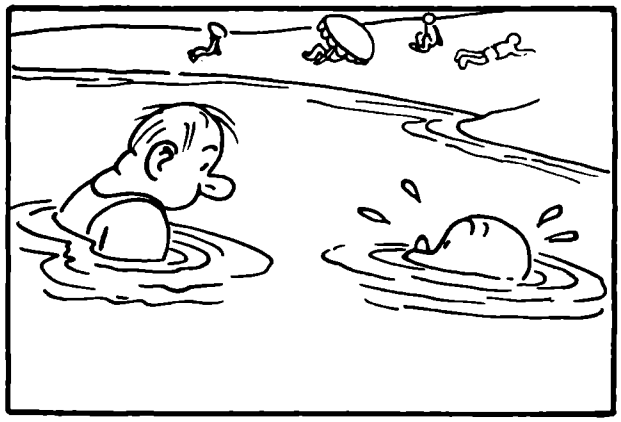

দ্যাখো আমি কীভাবে
ভেসে আছি!

সাঁতার শেখো! সাঁতার শেখো!

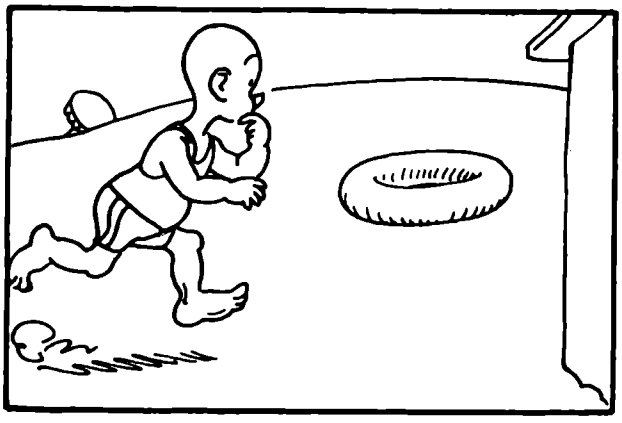

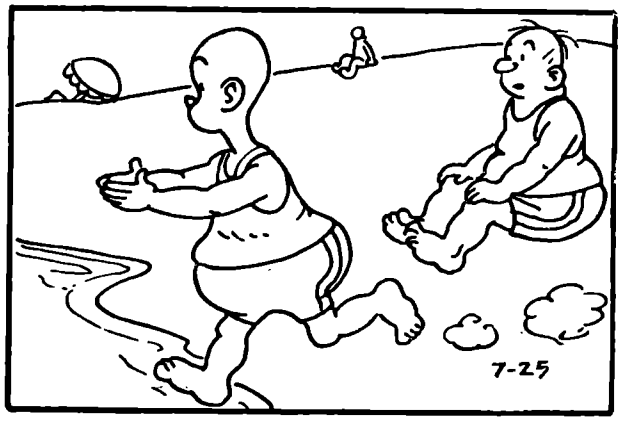
7-25

অলৌকিক

বিমল কর

আগে যা ঘটেছে

বরদা আর মানিকের একসঙ্গে সিনেমা দেখতে যাবার কথা ছিল। বন্ধু মানিক এসে পৌঁছতে পারেনি। বরদা একাই বসে ছিল সিনেমায়। তার পাশে এসে বসল অচেনা এক ভদ্রলোক। সিটে বসে-বসেই লোকটা কখন যেন মরে গেল। সিনেমা ভাঙার পর বরদা ভয় পেয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। নীচে মানিকের সঙ্গে দেখা। মানিক তাকে যেতে দিল না। সামান্য পরে দেখা গেল; মরা লোক জ্যান্ত হয়ে দিব্যি চোখের সামনে দিয়ে হেঁটে চলে যাচ্ছে। বরদা আর মানিক ছুটে গিয়ে তাকে ধরল।

এই অদ্ভুত মানুষটির নাম সিদ্ধেশ্বর। আলাপ করার পর তিনি বরদাদের তাঁর বাড়িতে আসতে বললেন পরের দিন বিকেলে।

সিদ্ধেশ্বরের সদর স্ট্রীটের বাড়িতে গিয়ে বরদারা জানল, ভদ্রলোক এক গবেষণার কাজ নিয়ে রয়েছেন। কোনো কোনো মানুষের মধ্যে অবিশ্বাস্য, অলৌকিক এক শক্তি থাকে। সেটা কেমন করে হয়—এই তাঁর গবেষণার কাজ। অবশ্য এই সব গবেষণা কলকাতার বাড়িতে হয় না—বাইরে দুমকার দিকে একটা সেন্টার আছে, সেখানেই হয়।

সিদ্ধেশ্বর বরদাকে দুমকা যাবার আমন্ত্রণ জানালেন। বরদা মনঃস্থির করতে পারছিল না। তারপর—

৪

নিউ মার্কেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে বরদার পা ধরে গেল। সিদ্ধেশ্বরের দেখা নেই। আজ সে একলা। মানিক নেই। আসতে পারবে না মানিক। তা ছাড়া, সিদ্ধেশ্বর বরদার সঙ্গেই দেখা করতে চেয়েছেন, মানিকের সঙ্গে নয়।

অপেক্ষা করতে করতে বরদা যখন বিরক্ত বোধ করছে, সিদ্ধেশ্বর হাজির হলেন।

বরদা বলল "আমি ভাবছিলাম আপনি বোধহয় আজকের কথা ভুলেই গেলেন।" ঠাট্টার গলাতেই বলল বরদা, সামান্য বিরক্তিও রয়েছে।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "আমি একটা কাজে আটকা পড়ে-ছিলাম। কতক্ষণ এসেছেন আপনি?"

"পাঁচটার আগেই।"

"একটু দেরি হয়ে গেল...। চলুন আমরা বসি। আপনাকে আর দাঁড় করিয়ে রাখা যায় না।"

পা বাড়াল বরদা। "কোথায় বসবেন?"

"আসুন। বসার জায়গা রয়েছে।"

বরদা সিদ্ধেশ্বরের পাশে-পাশে হাঁটতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে বলল, "আপনি মানিককে কাল কি কিছু খাইয়ে দিয়েছিলেন?"

ঘাড় ফেরালেন সিদ্ধেশ্বর। "কেন?"

"বাড়ি ফিরে ও চোখে খুব ঝাপসা দেখছিল। ডাক্তারের কাছে গিয়ে ওষুধ নিয়ে চোখে দিয়েছে।"

"সকালে কেমন আছেন?"

"ভাল। চোখ পরিষ্কার হয়ে গেছে।"

সিদ্ধেশ্বর কোন কথা না বলে হাঁটতে লাগলেন। গোব সিনেমার পাশের গলি দিয়ে নিয়ে চললেন বরদাকে।

বরদার সন্দেহ হল; মানিকের কথায় সিদ্ধেশ্বর অবাকও হলেন না, প্রতিবাদও করলেন না। তা হলে কি উনি কিছু খাইয়ে দিয়ে-ছিলেন চায়ের সঙ্গে?

বরদা বলল, "মানিককে আপনি কোনো ওষুধ-টষুধ খাইয়ে দিয়েছিলেন?"

মাথা নাড়লেন সিদ্ধেশ্বর। "না, আমরা কিছুই খাইয়ে দিইনি। আপনাদের ছোটখাট যা হবে, সবই আমাদের দুষ্কর্ম, এ-কথা কেন ভাবছেন? মানিকবাবুর সঙ্গে আমার কোনো শত্রুতা নেই।"

"তা হলে?"

"হয়ত ওঁর কোনো চোখের রোগ আছে।"

গলি দিয়ে খানিকটা এগিয়ে বাঁ দিকের একটা বাড়িতে ঢুকে পড়লেন সিদ্ধেশ্বর। বরদাকে ডাকলেন। এমন বাড়ি বরদা জীবনে দেখেনি। কত কালের পুরনো বাড়ি, সোঁদা স্যাঁতসেঁতে গন্ধ, ইঁদুর আর ছুঁচোর আড়ত, ভাঙাচোরা কাঠের সিঁড়ি, গুদোম-খানার দুর্গন্ধ, আর আলো না থাকার মতন, নীচে বড়-বড় ঘর, কারা থাকে কে জানে। কেমন একটা শুকনো চামড়ার গন্ধও আসছিল।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বরদা বলল, "এ বাড়িতে কারা থাকে?"

"বেশির ভাগ থাকে কেরলের লোক, নিউ মার্কেটের পেছনে যাদের বেতের জিনিসপত্রের দোকান। অনেকের গুদোমঘরও নীচে।"

তেতলায় এসে বরদা হাঁফ ছাড়ল। আলো-বাতাস পাওয়া গেল এতক্ষণে।

একটা ঘরে এসে বরদাকে বসালেন সিদ্ধেশ্বর। মোটামুটি বড় ঘর মাথার ওপর পুরনো আমলের কড়ি-বরগা। পাখা ঝুলছে। বাতিও সিলিং থেকে ঝোলানো। বসার ব্যবস্থা বলতে মোটা মোটা সেকেলে সোফাটোফা, একপাশে একটা লোহার খাট, বিছানা পাতা রয়েছে খাটে। কোনার দিকে টেবিল। তার ওপর যাবতীয় জিনিস জড় করা।

সিদ্ধেশ্বর বরদাকে বসিয়ে একটু বাইরে গেলেন; ফিরে এলেন আবার।

"কফি খান। রবিন ভাল কফি করে।"

বরদা ক্লান্তিবশত একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়েছিল।

সিদ্ধেশ্বর বসলেন। মুখোমুখি।

সামান্য চুপচাপ থেকে সিদ্ধেশ্বর বললেন, "আপনি কিছু ঠিক করলেন?"

বরদা সিদ্ধেশ্বরের দিকে তাকাল। "যেতে তো ইচ্ছে করে।"

"চলুন তাহলে?"

"একলা-একলা যেতে ভাল লাগে না। মানিক যদি যায়—"

"আপনি ভয় পাচ্ছেন।"

"না না, ভয় কিসের!" মাথা নাড়ল বরদা।

"মানিকবাবু চাকরি করেন, তাঁর যদি সুযোগ না হয়?"

"আমি ওকে রাজি করিয়ে নেবার চেষ্টা করছি।"

সিদ্ধেশ্বর সামান্য চুপ করে থেকে বললেন, "মানিকবাবু যেতে চাইলে আমার কোনো আপত্তি নেই; কিন্তু উনি যেতে না পারলেও আপনি চলুন।"

বরদা সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকল। কাল রাত্রে সে অনেকক্ষণ সিদ্ধেশ্বরের কথা ভেবেছে। মানুষটিকে অবিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না; আবার এমন কথাও মনে হয়,

এত লোক থাকতে বরদাকে দুমকা নিয়ে যাবার জন্যে তাঁর আগ্রহ কেন? অবশ্য, বরদা নিজেই খানিকটা উৎসাহ ও কৌতূহল যে প্রকাশ করেছিল তা অস্বীকার করা যাবে না।

বরদা বলল, "আমাকে আপনি নিয়ে যেতে চাইছেন কেন? আমি তো আপনাদের ব্যাপার কিছু বুঝব না, শুধু যাব আর দেখব।" বলে বরদা হালকা করে হাসল, "তা ছাড়া আমার কোনো বিশেষ ক্ষমতাও নেই যে, আমায় নিয়ে গবেষণা করবেন।"

সিদ্ধেশ্বর বরদাকে লক্ষ করছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন না কথার। পরে বললেন, "আপনি যেতে না-চাইলে যাবেন না, তাতে কী! তবে যদি যান, অনেক কিছু দেখতে পাবেন, যা আগে কখনও দেখেননি।"

বরদা হেসে ফেলল। হালকা করেই বলল, "যা দেখেছি এতেই অবাক হয়েছি, স্যার।"

মাথা নাড়লেন সিদ্ধেশ্বর। বললেন, "এ-সব কিছু না। আশ্চর্য-আশ্চর্য ব্যাপার আপনি দেখতে পাবেন।...আপনি কি এমন কোনো মানুষ আজ পর্যন্ত দেখেছেন যার বাঁ হাতের ওপর রঙ দিয়ে উল্কি পরিয়ে দিলে সেটা ডান হাতেও ফুটে উঠবে? শুধু উল্কিই বা কেন, ধরুন তার বাঁ হাতে আপনি জোরে মারলেন কিছু দিয়ে—কালসিটে ফুটে উঠল। একটু পরে দেখবেন তার ডান হাতের সেই একই জায়গায় আর-একটা কালসিটে ফুটে উঠেছে।"

বরদা অবাক হয়ে সিদ্ধেশ্বরের দিকে তাকিয়ে থাকল। পাতা পড়ল না চোখের। কথাটা তার বিশ্বাস হচ্ছিল না। বাঁ হাতের সঙ্গে ডান হাতের সম্পর্ক কী? কেমন করে তা হবে?

সিদ্ধেশ্বর নিজেই বললেন, "আমাদের ওখানে এমন লোকও আছে, যে চোখে দেখে না, কানে শোনে না কিন্তু এক-একদিন সে কিসের এক আশ্চর্য শক্তি পায়, একেবারেই আচমকা—তখন সেই লোকটি আপনাকে হাত তুলে আকাশের তারা পর্যন্ত চিনিয়ে দিতে পারে, অনেক দূরের যে-কোনো শব্দ সে নির্ভুলভাবে চিনে নিতে পারে।"

এমন সময় সাধারণ একটা বেতের গোল ট্রে নিয়ে একটা লোক ঘরে এল।

বরদা লোকটিকে দেখল। দেখার মতন চেহারা। লম্বা-চওড়া চেহারা, যেন লোহায় গড়া, কুচকুচে কালো রঙ গায়ের, মাথার চুল ছোট-ছোট, কোঁকড়ানো, নাকটা ভাঙা-ভাঙা, সাদা ধবধবে দাঁত, একদিকের কান নেই, মানে কান-কাটা গোছের। গায়ে আর জাহাজী ডোরাকাটা গেঞ্জি, পরনে প্যান্ট।

ট্রে নামিয়ে রাখল লোকটি। দু মগ কফি, আর প্লেটে কয়েকটা প্যাসট্রি।

দাঁড়াল না লোকটি, চলে গেল।

বরদা বলল, "কে এই লোকটা?"

"ওর নাম রবিন; ঝাঁঝা অ্যাংলো কলোনিতে থাকত একসময়। রেলে চাকরি করত, ফায়ারম্যান ছিল। বড় সাংঘাতিক লোক। দুর্ব্যবহার করার জন্য চাকরি যায়। চাকরি-বাকরি যাবার পর থেকে দুষ্কর্ম করে বেড়াত। পরে আমাদের কাছে এসেছে।"

বরদা কফির মগ তুলে নিতে-নিতে বলল, "ওরও কি কোনো বিশেষ ক্ষমতা আছে?"

সিদ্ধেশ্বর যেন একটু হাসলেন। "তা আছে বইকি।"

"কী ক্ষমতা?"

সিদ্ধেশ্বর প্যাসট্রির প্লেটটা তুলে বরদার দিকে এগিয়ে দিলেন। বললেন, "বললে আপনি ভয় পাবেন। অবশ্য আপনার ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। এই ধরুন আপনি—আপনাকে কোনো কারণে আমাদের দরকার। রবিনকে হুকুম করলেই সে আপনাকে যেমন করে হোক আমাদের কাছে পৌঁছে দেবে।"

বরদার হাত কেঁপে উঠল। বোকার মতন তাকিয়ে থাকল সিদ্ধেশ্বরের দিকে। ঢোঁক গিলল; বলল, "লোকটা গুণ্ডা?"

"তা বলতে পারেন।"

"আপনারা গুণ্ডা পোষেন?"

"না, তা নয়। আমরা চোর ডাকাত স্মাগলার নই যে, আমাদের গুণ্ডা পুষতে হবে। তবে আমাদের দু-একজন শত্রু রয়েছে। তারা নানাভাবে ক্ষতির চেষ্টা করে আমাদের। নিজেদের বাঁচাবার জন্যে রবিনের মতন দু-একজনকে রাখতে হয়।"

বরদা কফিতে চুমুক দিল। হাতে প্যাসট্রি।

সিদ্ধেশ্বরও কফি খেতে লাগলেন।

বরদা বলল, "এই বাড়ি—মানে ফ্ল্যাটটি কি আপনাদের?"

"হ্যাঁ। এখানে যিনি থাকেন তিনি এখন কলকাতায় নেই। রবিনও এখানে থাকে।"

"কে থাকে এখানে?"

"পালসাহেব। পালসাহেব একজন প্যাথলজিস্ট। আমাদের লোক। খানিকটা অ্যাবনরমাল। কাজকর্ম ভাল করেন। তবে খেপামিটা মারাত্মক।" সিদ্ধেশ্বর হাসলেন।

বরদা বুঝতে পারছিল না তাকে সিদ্ধেশ্বর কোনো ফাঁদে ফেলছেন কি না! প্রথম থেকে দেখলে মনে হয়, ধীরে-ধীরে যেন একটা জাল বরদার চারপাশে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, এখন সেটা গুটিয়ে নিতে চাইছেন সিদ্ধেশ্বর। আবার তেমন করে খুঁটিয়ে না দেখলে মনে হবে, যা ঘটেছে সবই আচমকা। বরদারা নিজেরাই সিদ্ধেশ্বরের দিকে এগিয়ে গিয়েছে, সিদ্ধেশ্বর তাদের টেনে নিয়ে যাননি। কিন্তু সেই সিনেমা হাউস থেকে শুরু করে পরপর যা হয়েছে তা কি বরদাকে ফাঁদে ফেলার জন্যে নয়?

বরদা হঠাৎ বলল, "আচ্ছা সিদ্ধেশ্বরবাবু যদি আমি না যাই, আপনি কি ওই রবিন গুণ্ডাকে আমার পেছনে লাগিয়ে দেবেন?"

সিদ্ধেশ্বর সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়লেন, জিভ কাটার ভঙ্গি করলেন। "আরে ছি ছি—তাই কি হয়? আপনি নিজের ইচ্ছেয় যাবেন, না হয় যাবেন না।"

বরদা নিশ্বাস ফেলল।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। ভরসা হচ্ছে না। আমি আপনাকে বলছি, আপনার সমস্ত দায়িত্ব আমার। আমরা চোর ডাকাত খুনের দল নই। আমরা মানুষকে ঠকিয়ে পয়সা রোজগারের মতলব করি না। আপনার ক্ষতি আমরা কেন করব! আপনি আমার ওপর ভরসা করে চলুন। অনেক নতুন অভিজ্ঞতা হবে।"

বরদা প্যাসট্রিটা শেষ করল। কফিতে মুখ দিয়ে বলল, "বাড়িতে একবার বলতে হবে।"

"বলবেন।"

"বাড়ির লোক যদি রাজি না হয়?"

"বেড়াতে যাচ্ছেন বললে কেন রাজি হবেন না। আপনি ছেলে-মানুষ নন।"

বরদা আর কোনো কথা বলল না।

কফি খাওয়া শেষ হল।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "একটা কথা আপনাকে এত আগেভাগে বলা উচিত নয়, তবু বলে রাখি। আপনাকে আমি আমার বন্ধু হিসেবেই নিয়ে যাব। কিন্তু সেখানে বিশেষ একজনের কাছে আপনার সঙ্গে আমি ঠিক বন্ধুর আচরণ করব না। বরং উলটো আচরণও করতে পারি। আপনি আমার অভিনয় মেনে নেবেন। নিজেও সেই রকম অভিনয় করবেন। আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করবেন, চড় লাথি মারবেন, গালমন্দ করবেন। আপনি যত ভাল অভিনয় করবেন —ততই আমার সুবিধে।"

বরদা অবাক হয়ে বলল, "আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না।"

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "আজকাল সব ব্যাপারেই ভেজাল জোটে। আমাদের ওখানে কখনো-সখনো এই রকম জাল-মানুষ এসে যায়। হয় আমাদের ভুলে, না হয় তাদের কৃতিত্বে। আজ প্রায় চার-পাঁচ মাস ধরে এই রকম এক জাল প্রেত-বিশারদ এসে জুটেছে। আমার বিশ্বাস, লোকটা আমাদের এখানকার দু-একজনকে সঙ্গে নিয়ে পালিয়ে যাবার মতলব করেছে। যদি পালিয়ে যেতে পারে, মানুষকে ভুতুড়ে ব্যাপার-স্যাপার দেখিয়ে রাতারাতি দেদার পয়সা কামিয়ে নেবে। আমাদের দেশে ভুতুড়ে ব্যাপারের বাজার খুব ভাল। লোককে ঠকানো সহজ। এ-দেশের মানুষ আরও সহজে ঠকে।"

বরদা আবার একটা সিগারেট ধরাল। বলল, "আপনি কি জাল ধরবার জন্যে আমাকে নিয়ে যেতে চান?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু আমি কি আপনাকে সাহায্য করতে পারব?"

সিদ্ধেশ্বর মাথা হেলিয়ে বললেন, "পারবেন।" তারপর শার্টের পকেট থেকে একটা খাম বার করলেন। খামের মধ্যে ফোটো ছিল। ফোটোটা বরদার দিকে এগিয়ে দিলেন। বললেন, "দেখুন।"

হাত বাড়িয়ে ফোটোটা নিল বরদা। পোস্টকার্ড সাইজের ফোটো।

চোখের সামনে ফোটোটা ধরতেই বরদা চমকে উঠল। শব্দ করল অস্ফুট, পাতা আর পড়ে না চোখের। বুক ধকধক করছিল। গলা শুকিয়ে গেল বরদার। বরদা তোতলার মত করে বলল, "এ ছবি কার? আমার মতন দেখতে?"

সিদ্ধেশ্বর বললেন, এই ছবি যার, সে হল জাল প্রেত-বিশারদ। আপনার মতনই দেখতে, কিন্তু সামান্য তফাত আছে। এর নাম মহাদেব দাশ। মহাদেবকে আমি একটা শিক্ষা দিতে চাই। ও একটা জোচ্চোর বদমাশ। যে মতলব নিয়ে সে আমাদের কাছে এসেছে তার সেই মতলব আমি জানতে পেরেছি।...বরদাবাবু, আপনি আমায় সাহায্য করুন।"

বরদা কেমন নির্বোধের মতন সিদ্ধেশ্বরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। কী বলবে বুঝতে পারল না।

সিদ্ধেশ্বর অনুনয়ের মতন করে বললেন, "আপনি আমায় সাহায্য করুন।"

বরদা যেন হুঁশ ফিরে পেল। বলল, "আপনি কি এই উদ্দেশ্যে আমার পিছু ধরেছেন?"

"আমি একটা কাজে কলকাতায় এসেছিলাম," সিদ্ধেশ্বর বললেন। "সেদিন যখন সিনেমা হাউসের কাছে অন্যমনস্কভাবে ঘোরাঘুরি করছিলাম, আপনাকে দেখতে পেয়ে যাই আচমকা। তখন থেকেই আমার মাথায় একটা অভিসন্ধি ঘুরছিল।"

"তার মানে আমাকে আপনি ফাঁদে ফেলেছেন।"

"তা নয়। তবে আপনি আমায় একটা সুযোগ করে দিতে পারেন এইমাত্র।...আপনি বিশ্বাস করুন, আমরা যা করি গবেষণার জন্যেই করি, ভেলকি দেখিয়ে পয়সা কামাবার জন্যে নয়।"

"এই ছবিটা কি আপনি সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন আগেই?"

"না। আপনাকে দেখার পর সেই দিন রাত্রেই আমি সদর স্ট্রীট থেকে লোক পাঠিয়ে দিয়েছিলাম পি পি রিসার্চ সেন্টারে। আজ সকালে সে ছবি নিয়ে ফিরেছে।"

বরদা আবার একবার খুঁটিয়ে ছবিটা দেখল। মহাদেব দাশ যদি কোনোদিন কলকাতায় এসে বরদার বাড়িতে ঢুকে পড়ে, বাড়ির লোক বোধ হয় সহজেই লোকটাকে বরদা বলে ধরে নেবে। আর যদি তখন বরদা বাড়ি থাকে—দুই বরদা নিয়ে এক হইচই পড়ে যাবে।

হঠাৎ কী মনে করে বরদা হেসে ফেলল। তারপর সিদ্ধেশ্বরের দিকে তাকাল। *বলল, "আমি যাব। আপনার সঙ্গেই।"*

(ক্রমশ)

ভুতুড়ে গাড়ি

মামার সঙ্গে সম্পর্ক এমনি করে চুকেবুকে গেল উইলোবির।
মামা, বুড়ি তো কিছুতেই বাড়ি ছাড়বে না! ছেড়ে দাও না ব্যাপারটা!
গর্‌র্‌র্‌

আর হ্যাঁ, সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কোতে না-ই বা বাড়ি তুললে, যেমন আছে থাক না শহরটা!
গর্‌র্‌র্‌

ছেলেটা দেখছি মহা পাজী!
খট্‌-!

ভাগ্নের বেয়াদপিতে খেপে গিয়ে অ্যালেক্সো হক্‌ প্রতিজ্ঞা করলেন, যে করেই হোক তাঁর পথের বাধা তিনি হঠাবেন...
বুড়ির ওই গাড়িটা আমি লোপাট করে দেব।

জোয়ান বয়সে মিসিসিপি অঞ্চলের সবচেয়ে নামী গাড়ি-হাতানো লোক ছিলুম আমি। লোকে তো আমাকে 'ওস্তাদ হক্‌' বলে ডাকত!

কিছুক্ষণ পরে...
ভদ্রমহিলা তো বাড়িতে নেই!
ঠিক্‌ আছে, যাও তুমি!
53

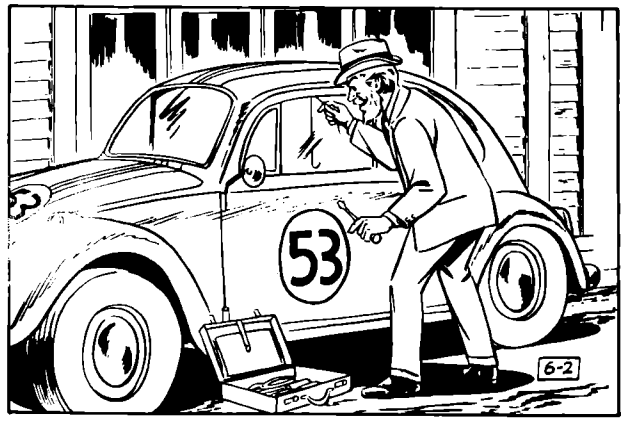
53
6-2

লা-লা-লা...

লা-লা-লা...

আরে বাবা! জোয়ান বয়সের শিক্ষা মানুষ কিছু ভোলে না!
'হক'—একশো তিরিশ তলা বাড়ি তৈরী হবে এখানে!
'হক'
27
(পোতা ওল্টাও)

হার্বি তো তার বিপদের কথা আঁচ করতে পারেনি, তাই বেশ শান্তশিষ্ট ভাবেই চলতে লাগল তার মালিকের শত্রুপক্ষের সঙ্গে...
ওঃ! তার এই লক্‌কড় গাড়িটা বেপাত্তা হয়ে গেছে দেখে, ফিরে এসে বুড়ি তো একেবারে ভ্যাবাচাকা খেয়ে যাবে!
দিব্যি চলতে লাগল গাড়িটা তারপর...
ঝংঝড়াং...
অ্যালেঞ্জো হক্‌ গাড়িটা নিয়ে একটা গুদামে ফেলে দেবার তালে আছে...
আরে বাবা, ছ'বছরের একটা বাচ্ছাও এই খুদে গাড়িটা চুরি করতে পারে!
চৌরাস্তার মাঝখানে গিয়ে হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেল হার্বি...
স্ক্রীইইচ্‌...
কিছুক্ষণের মধ্যে...
প'ক!
প'ক!
পিপ্‌!
পিপ্‌!
প'ক!
প'ক!
পাক্কা দুঘণ্টা পর...
বেচারা হক্‌কে নিয়ে ছুটতে লাগল হার্বি...
'হক—শিল্প প্রতিষ্ঠান'
(এর পর আগামী সংখ্যায়)

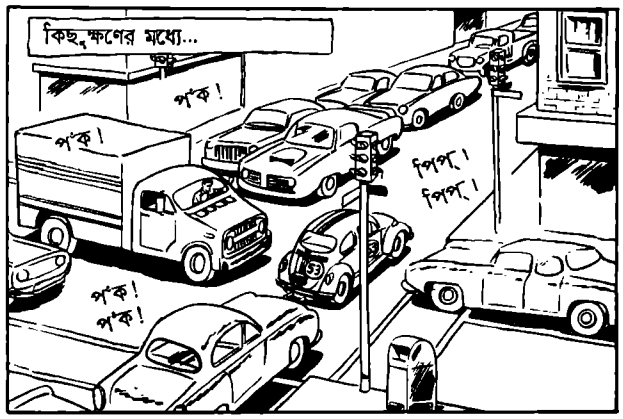

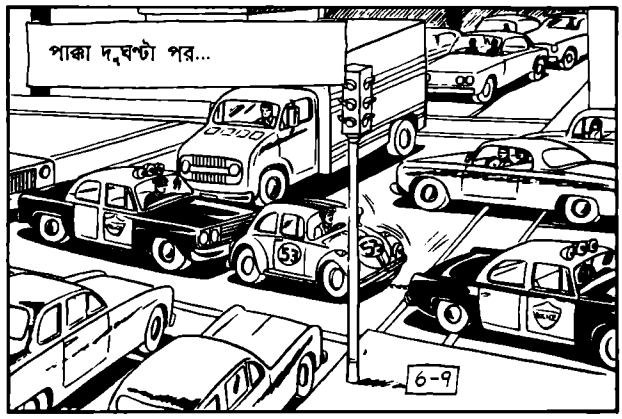

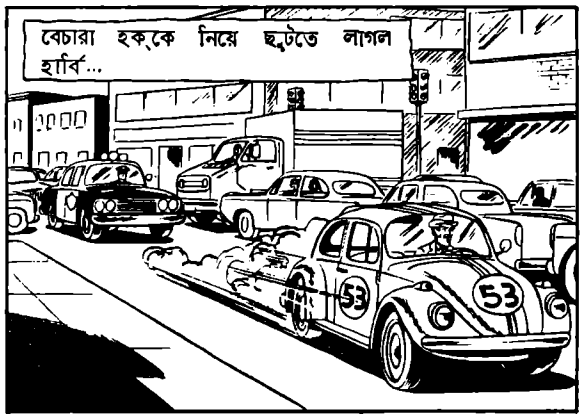

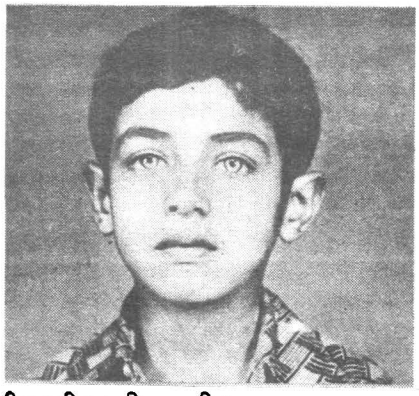

শিশুশিল্পী রাজীব মুখোপাধ্যায়

সম্প্রতি লনডনের কমনওয়েলথ সোসাইটি ফর দি ডেফ কর্তৃক আয়োজিত চিত্র-প্রতিযোগিতায় কলকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়ের চারজন ছাত্র পুরস্কৃত হয়েছে। সত্যজিৎ ভট্টাচার্য (১২ থেকে ১৫ বছর বয়সের গ্রুপে) প্রথম পুরস্কার পেয়েছে। রাজীব মুখোপাধ্যায় ছাড়া অপর দুজন পুরস্কৃত শিল্পীর নাম অজয়কমার দত্ত ও মুনমুন মজুমদার।

মুক্তোর পুতুল টুকটুকি

ছোট্ট মেয়ে মুক্তো, তার একটা খুব সুন্দর পুতুল ছিল। তার নাম টুকটুকি। পুতুলটাকে মুক্তো ভীষণ ভালবাসত, আর তার সংগে সারাক্ষণ খেলা করত। টুকটুকিকে ছেড়ে সে এক মিনিটও থাকতে পারত না। সেদিন ছিল তার জন্মদিন। সে, নাচতে নাচতে গিয়ে মাকে বলল, মা, আজ তো আমার জন্মদিন, তাই তুমি টুকটুকির জন্য মিষ্টি দাও।' এই কথা শুনে মুক্তোর মা তাকে অনেক মিষ্টি দিলেন। তখন মুক্তোকে আর পায় কে! সে টুকটুকিকে কোলে নিয়ে সারা বাড়ি ঘুরতে লাগল। জন্মদিনে বাড়ি ভর্তি লোক। মাসী, পিসী, দাদা, দিদি, ভাই, বোন সবাই এসেছে—আর সংগে এসেছে অনেক পুতুল, রেলগাড়ি আরও কত কী! সব্বাই যখন খুব ব্যস্ত তখন টুকটুকিকে নিয়ে একটা ইঁদুর দূরের ওই পাহাড়ে পালিয়ে গেল।

একটু পরেই খোঁজ পড়ল টুকটুকির। টুকটুকিকে দেখতে না পেয়ে মুক্তোর সে কী কান্না! ওকে কাঁদতে দেখে একটা টুনটুনি পাখি এসে বলল, 'আমি জানি টুকটুকি কোথায়। একটা ইঁদুর তাকে ওই পাহাড়ে নিয়ে গেছে। তুমি এখন খেলা করো, তোমার মা যখন ঘুমিয়ে পড়বে তখন আমি এসে তোমায় আমার পিঠে করে নিয়ে যাব ওই পাহাড়ে। রাত্রে ইঁদুরভায়া যখন ঘুমিয়ে পড়বে তখন আমরা টুকটুকিকে নিয়ে পালিয়ে আসব।' এই বলে সে ফুড়ুত করে উড়ে গেল।

রাত্রিবেলা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু মুক্তো জেগে আছে, টুনটুনির সংগে যাবে বলে। বাড়ি নিস্তব্ধ, মুক্তো ভাবছে কখন টুনটুনি আসবে। এমন সময় টুনটুনি পাখি এসে বলল, 'মুক্তো জেগে আছ? যাবে না টুকটুকিকে আনতে?' মুক্তো লাফ দিয়ে টুনটুনির পিঠে উঠে বসল। তখন টুনটুনি মুক্তোকে পিঠে নিয়ে সেই পাহাড়ে উড়ে গেল। ইঁদুরের গর্তে টুকটুকি। মুক্তো আস্তে আস্তে তাকে বার করে আনল, তারপর দূরে থেকে ইঁদুরকে বকে দিয়ে টুনটুনির পিঠে চড়ে ফিরে এল বাড়িতে।

বর্ণালী পাল (বয়স—১১)

চোর ধরা

আমাদের বাড়িতে একটা দারোয়ান আছে। দারোয়ান খালি খেত, ঘুমোত আর মোটা হত। সে তার কাজ করত না। যদি বাবা জিজ্ঞেস করতেন, 'কেন এতগুলো কাঁঠাল চুরি হল?' সে উত্তর দিত, 'বাবু আজ রাতেই চোর ধরব', সে খালি কথা বলত, কিন্তু কাজ করত না। তাই একদিন বাবা তাকে বললেন, 'কাজ না করলে কিন্তু তোমাকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেব।' তাই শুনে সে বলল, 'বাবু, আজই আমি চোর ধরব।' রাতে বাবা দেখলেন, সে তার লাঠি হাতে নিয়ে বাগানে ঘুরছে। বাবা যেই ফিরে আসতে যাবেন তখুনি সে চিৎকার করে বলল, 'ধরেছি, ধরেছি, চোর ধরেছি।' বাবা টর্চ জ্বালিয়ে দেখলেন, সে একটা গাছকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করছে।

অঞ্জনা গুপ্ত (বয়স—১০)

বৃষ্টির দিনে

বৃষ্টির দিন আমার খুব ভাল লাগে। সারাদিন জানালায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখি। কাগজের নৌকা তৈরি করে জলে ভাসাই। বৃষ্টির দিনে বাড়িতে খিচুড়ি রান্না হয়। খিচুড়ি খেতে আমার খুব ভাল লাগে, কিন্তু খেলতে যেতে পারি না। বাড়িতে বসে লুডো খেলি। আমার ভাই লুডোর ঘুঁটিগুলো নিয়ে নেয়। যখন মেঘ ডাকে তখন খুব ভয় করে।

নন্দিনী বসু (বয়স-৭)

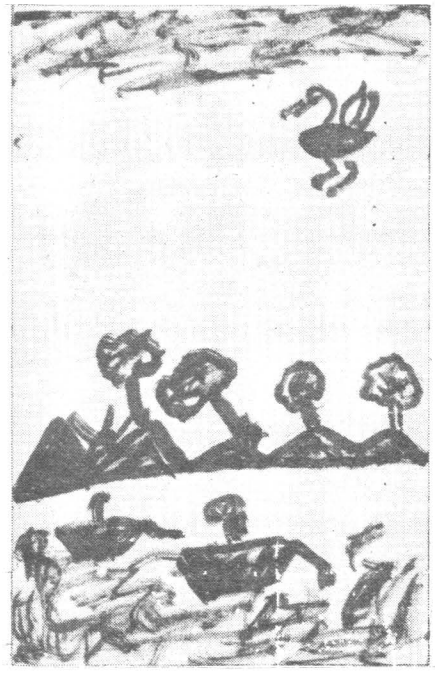

ছবি এঁকেছে রাজর্ষি মিত্র (বয়স ৬)

চিঠি

আমি রানাঘাটে থাকি। হেমনলিনী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীতে পড়ি। মাসিক আনন্দমেলা পড়তে আমার ভীষণ ভাল লাগে। আগে কিন্তু আমি মোটেই পড়তে পারতাম না। খালি গল্প শোনাবার জন্যে দিদিদের বিরক্ত করতাম। এখন নিজে নিজেই সব গল্প, কবিতা পড়তে পারি।

মহুয়া মুহুরী (বয়স—৫)

আমি আর ভাই

আমি আর ভাই
দিনরাত খাই
খাবার না পেলে
কেবলি চেঁচাই

প্রগতি চৌধুরী (বয়স—৭)

ছয় ঋতু

গ্রীষ্মকালে শুকনো সবই
বর্ষাকালে বৃষ্টি,
শরৎকালে পুজোয় পুজোয়
ভরে আছে দৃষ্টি।
হেমন্তকালে চাষীরা সব
সোনার ধান লয়,
পাড়ায় যত গোলা ছিল
ধানে ভর্তি হয়।
শীতকালেতে গায়ে শুধু
লেপ-কম্বল মুড়ি,
বসন্তকালে দোল-যাত্রা
আবির ছড়াছড়ি।

সোমদত্তা নাথ (বয়স—৯)

ভল্লু

এক যে ছিল ভল্লু
তার ছিল এক উল্লু
সে দেখত কেবল বিষ্টি
আর খেত শুধু মিষ্টি

অমৃতাংশু দে (বয়স ৭)

স্নো-হোয়াইট

সাদা হরিণের বাচ্চা
খায় সে যা ইচ্ছা
দিলাম সবুজ ঘাস তাকে
পাউরুটি তার মধ্যে
হরিণ স্নো-হোয়াইট
সে ফর্সা এবং ব্রাইট।

সীজ মুখোপাধ্যায় (বয়স-৯)

চুমকি

দুষ্টু কুকুর চুমকি
তার পায়ে বাঁধা নুপুর
তালে তালে নাচে সে
ঝুমু ঝুমুক ঝুমকি।

সুগীতা ত্রিপাঠী (বয়স—৯)

টারজান
এডগার রাইস বারোজ
ওটা আমাদের ধরে ফেলবে, টারজান!

লাফিয়ে জলে নেমে নলবনের দিকে চলে যেও! আমি ওটাকে ঠেকিয়ে রাখব!
তা হয় না! আমি তোমার সঙ্গেই থাকব!

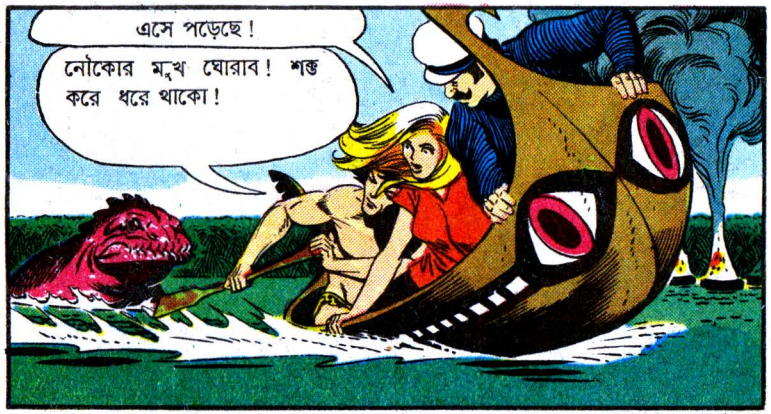
এসে পড়েছে!
নৌকোর মুখ ঘোরাব! শক্ত করে ধরে থাকো!

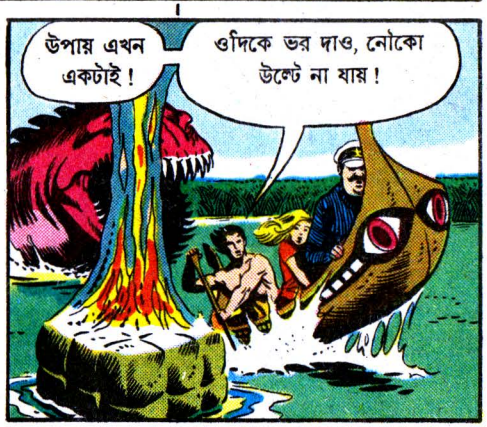
উপায় এখন একটাই!
ওদিকে ভর দাও, নৌকো উল্টে না যায়!

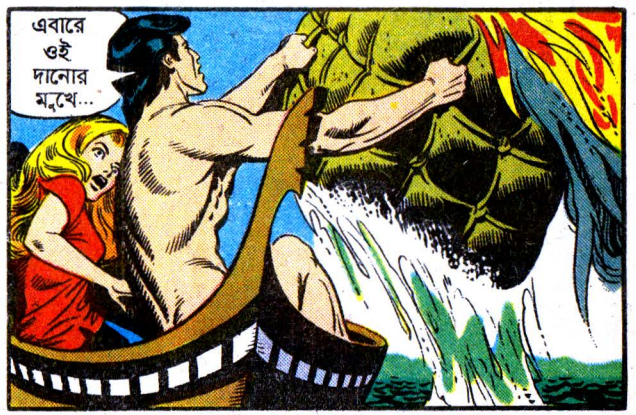
এবারে ওই দানোর মুখে...

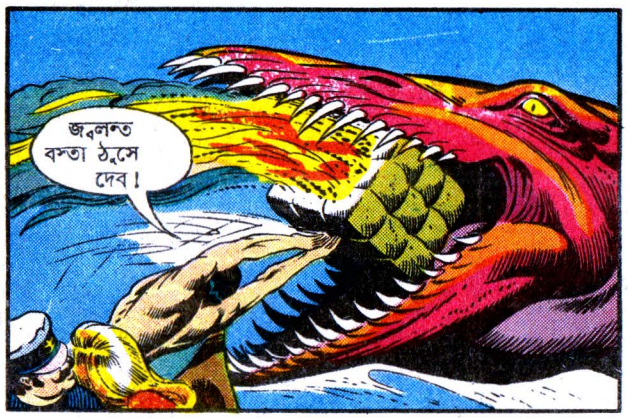
জ্বলন্ত বস্তা ঠুসে দেব!

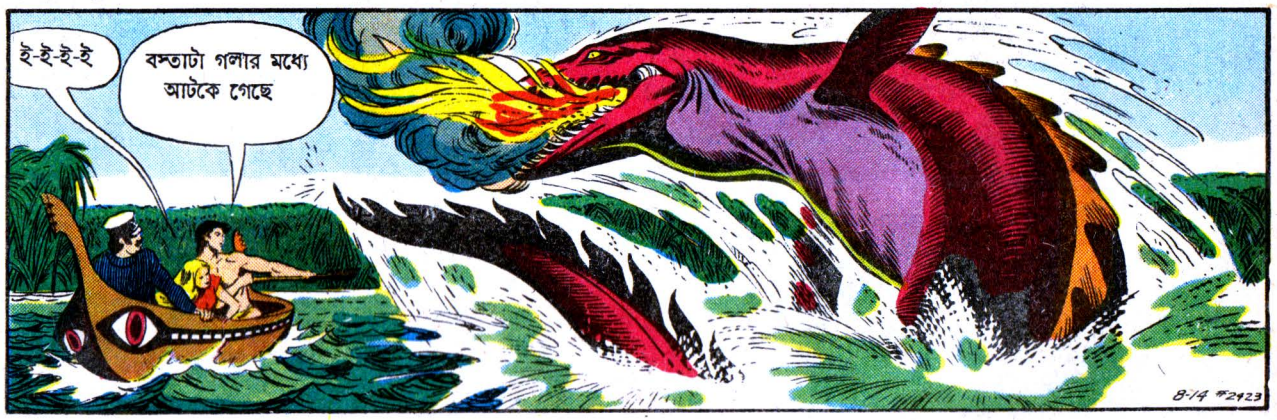
ই-ই-ই-ই
বস্তাটা গলার মধ্যে আটকে গেছে
8-14 *2423

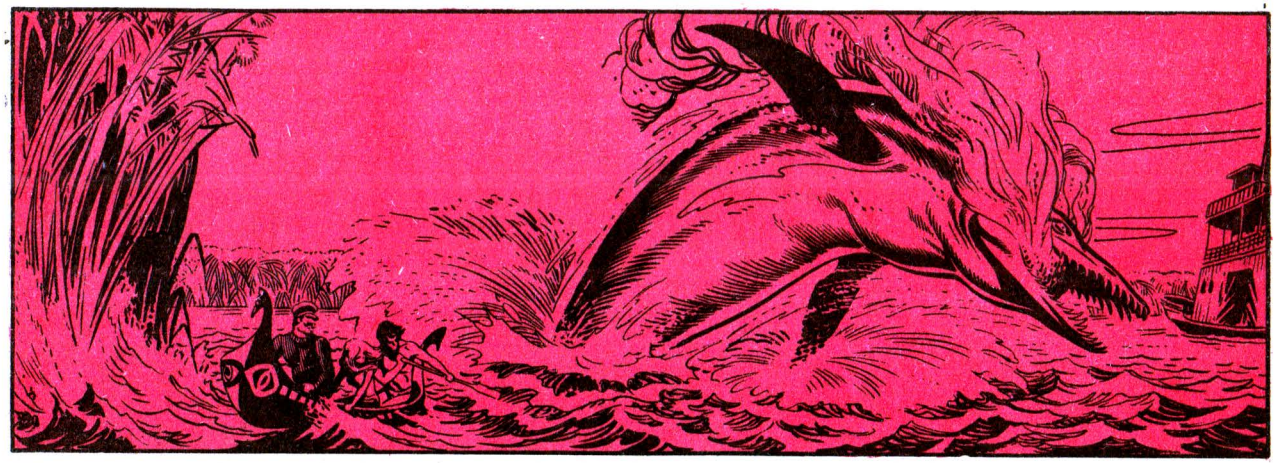

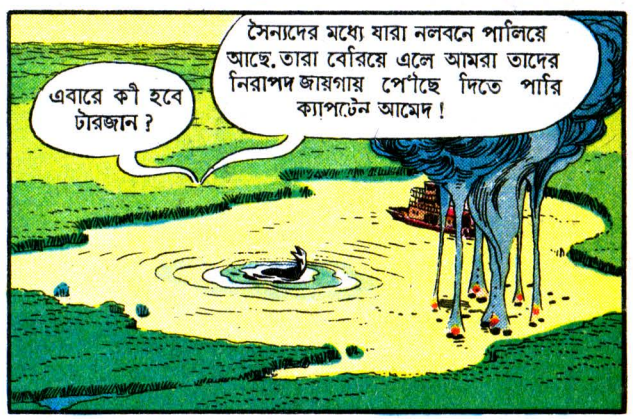

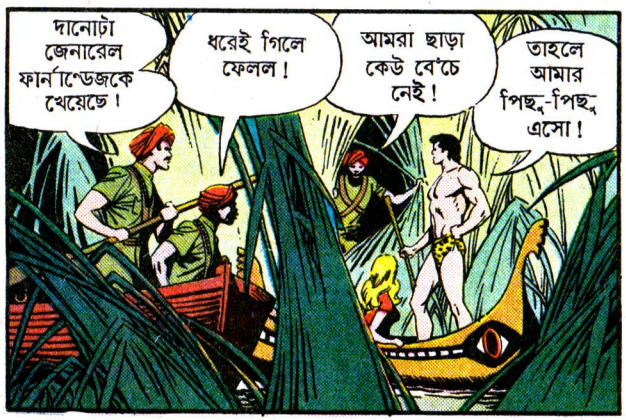

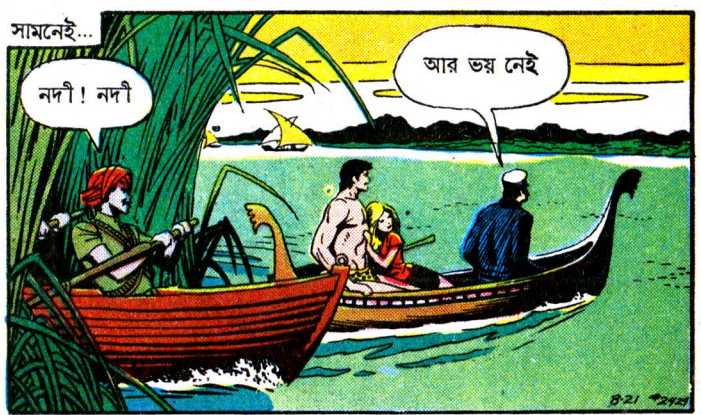

(এর পর ছাব্বিশের পাতায়)

এ বড় বাড়াবাড়ি

কুম্ভক

অনেকদিন পর ঘরে ঢুকতেই টুম্পি এসে জড়িয়ে ধরল : এসে গেছে, এসে গেছে কাকু।

কোথায় ডুব দিয়েছিলে বলো তো? জানতে চায় নন্তু।

বৌদির ধমকও শোনা গেল সঙ্গে সঙ্গে : আরে দাঁড়া, একটু জিরোতে দে আগে।

ওঃ, সেই-যে কটা বিসর্গ ছিটিয়ে দিয়ে দৌড় লাগালে, আর কোনো পাত্তা নেই।

সেই বিসর্গের দুঃখেই তো পালিয়েছিলাম রে।

বিসর্গের দুঃখে? দুঃখে একটা বিসর্গ আছে বটে, কিন্তু বিসর্গেও কি দুঃখ আছে না কি?

নেই? বিসর্গে তো বিরাট দুঃখ! এতদিন তো ছিলাম ভাল। কিন্তু যেই অনুস্বর-বিসর্গে এসে ঠেকলাম, অমনি খুব জব্দ হয়ে গেছি।

টুম্পি একটু এগিয়ে এসে বলে : কেন গো কাকু? জব্দ হলে কেন?

কেন? সে এক বৃত্তান্ত। আমাদের তো দরকার বাঙলা ভাষা নিয়ে? কিন্তু আশেপাশে ঝোপেঝাড়ে ঘাপটি মেরে বসে আছে সংস্কৃত। থেকে-থেকেই ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘাড়ে। বিসর্গে এলে সেটা টের পাওয়া যায় ভাল।

এই জন্যই তো আমরা ইস্কুলে বলি টুম্পি, বাঙলা লিখে একটু কলমের কালি ছিটিয়ে দাও, হয়ে যাবে সংস্কৃত!

আমি কিছু তোমাদের কথা বুঝতে পারছি না। কী দোষ করল বিসর্গ?

বিসর্গ যে স্বর্গ নয়, এটাই তার প্রধান দোষ।

আঃ, ওর মাথাটা গুলিয়ে দিস না নন্তু। শোন্ টুম্পি, ব্যাপারটা বলি। আমরা তো বলি 'মন'। সংস্কৃতে শব্দটা হলো 'মনঃ'। এই বিসর্গটা কি মানব আমরা?

মানছি না তো।

ঠিক, মানছি না। কিন্তু কখনো-কখনো ঘাড় ধরে মানিয়েও নিচ্ছে যে।

মোটেও না।

মোটেও না? যখন তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়, তখন? যখন তুমি অন্যমনস্ক হয়ে যাও, তখন? ওই স-গুলো আসে কোত্থেকে?

বিসর্গ থেকে। এই হচ্ছে গোলমাল। সন্ধিতে এসে পৌঁছলেই তোমাকে ভাবতে হবে, সংস্কৃতের সেই বিসর্গটাকে মানবে, না কি মানবে না। কেবলই কি সন্ধি? অন্য ঝামেলাও আছে। ধর্, যিনি ইতিহাসের পণ্ডিত, তাঁকে বলি ঐতিহাসিক। বিজ্ঞানের পণ্ডিত বৈজ্ঞানিক। ছন্দের যিনি পণ্ডিত, তাঁকে কী বলি? নন্তু জানিস?

ছান্দসিক।

ঠিক, ছান্দসিক। কিন্তু কথাটা তো ছিল ছন্দ। তার থেকে ছান্দিক হলে পারত। ছান্দসিক হলো কেন? স তো ছিল না কোথাও।

হলো, কেননা—

দাঁড়াও, দাঁড়াও। নন্তুকে থামিয়ে দিয়ে টুম্পি ঝাঁপিয়ে পড়ে! দাঁড়াও, আমার একটা অন্য কথা আছে। স-এর ব্যাপার শুনব পরে। আমি যে দেখছি এখানে আরো-সব বদল হচ্ছে। তার বেলা?

আর কী বদল হচ্ছে?

হচ্ছে না? ইতিহাস, ঐতিহাসিক। ছিল ই, হয়ে গেল ঐ। ছিল বি, হয়ে গেল বৈ। ছিল ছ, হলো ছা।

খায়দায় গান গায়, তাই রে নাই রে না!

ঠাট্টা নয় নন্তু, জবর ধরেছে টুম্পি। ঠিক বলেছিস, আগে ওইটেই বলে নেওয়া উচিত। আরও একটা নিয়ম আছে সত্যি। ব্যাকরণে একে বলে বৃদ্ধি।

কী বলে?

বৃদ্ধি। শব্দের সঙ্গে প্রত্যয় জুড়ে দিলে, শব্দের চেহারা তো পালটে যায় একটু? সেই পালটে যাবার নানা ধরন আছে। তারই মধ্যে একটা হলো এই স্বরধ্বনির বৃদ্ধি, বেড়ে যাওয়া।

বেড়ে যাওয়া? কোন্ দিকে বাড়ে?

কোন্ দিকে? এক-একটা এক-এক দিকে। অ হয়ে যায় আ। ছিল দশরথ, হয়ে গেল দাশরথি। ছিল রঘু, হয়ে গেল রাঘব। প্রদেশ, প্রাদেশিক। অভিজাত, আভিজাত্য।

আর ই হয়ে যায় ঈ?

না, না। ওটা তো হলো দীর্ঘীকরণ। ওটা বৃদ্ধি নয়।

নন্তু বলে : কত যে তোমাদের গোলমাল। এ বড় বাড়াবাড়ি।

কিছুই বাড়াবাড়ি নয়, খুবই সহজ। ই-ঈ হবে ঐ, উ-ঊ হবে ঔ, আর ঋ হবে আর।

ও, সেইজন্যে ঐতিহাসিক? উ দিয়ে বলো তো একটা।

গুরু থেকে গৌরব, কুরু থেকে কৌরব, পুর থেকে পৌর, সুর থেকে সৌর। কেমন? আর ঋ চাস? আর্ষ প্রয়োগ শুনেছিস? ঋষি থেকে আর্ষ, কৃশ থেকে কার্শ্য, ধৃতরাষ্ট্র থেকে ধার্তরাষ্ট্র, কৃতবীর্য থেকে কার্তবীর্য, ভৃগু থেকে ভার্গব...

বলতে না বলতেই শরবতের গ্লাস হাতে বৌদির আবির্ভাব : বড়-বাড়াবাড়ি শুরু করেছ সবাই, ব্যাকরণ কি একটু পরে হলে চলবে না?

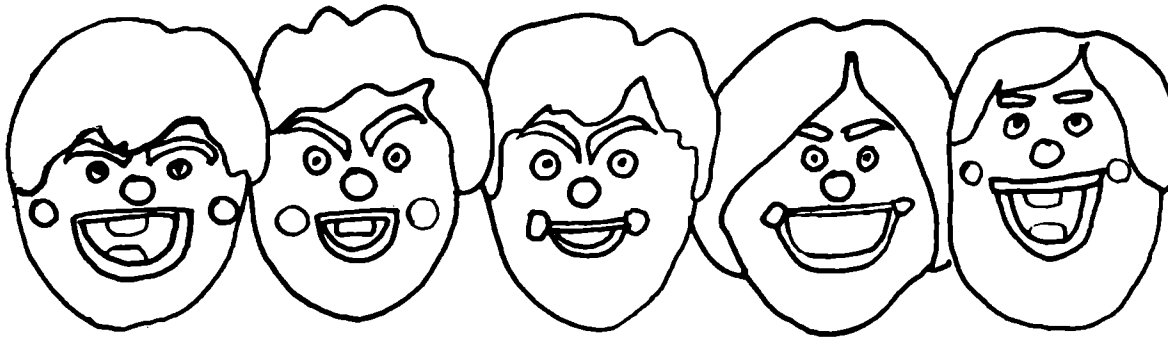

মাধুরীলতা

রথীন্দ্রনাথ

মাধুরীলতার ভাইফোঁটা

মানসী দাশগুপ্ত

ভাইফোঁটার সবটুকু মহিমা বোনেদের মমতা দিয়ে গড়া। কোন্ কবি লিখেছিলেন 'দেবতা ভ্রাতৃদ্বিতীয়ে প্রণমি তোমায়'? কোনো কবি-ভাই নন। কখনো না। এমন-যে বাঙালি জীবনের সমস্ত দিক ছুঁয়ে কলম চালানো খাঁটি বাঙলার কবি ঈশ্বর গুপ্ত, তিনিও বোনকে নিয়ে কিংবা ভাইদ্বিতীয়া নিয়ে কিছু লেখেননি। এই উপরের পংক্তিটি তো নয়ই। ওটি লিখেছিলেন যে-মহিলা, তাঁর কবিতা নিয়ে এককালে অনেক আলোচনা হত। এরকম বিশুদ্ধ সুন্দর ভঙ্গিতেই লেখা হোক, কিংবা ভুলভাল লোকচল্ ছাঁদেই লেখা হোক, দেখা যাচ্ছে বোনেদেরই কেবল 'গুণবতী ভাই'-এর জন্যে 'মন কেমন করে।' অবশ্য এর একটা দারুণ উজ্জ্বল ব্যতিক্রম আধুনিক বাংলা কবিতাতে আছে, কিন্তু তার কথা আজ বলব না তো। আজ বোনদের কথাই বলব। কেননা যাঁর খাতাখানি দেখে সেই সেকালের ভ্রাতৃদ্বিতীয়া-প্রণামের কবিতা মনে পড়ে গেল, তিনিও একজন বোন। তাঁর ছোটভাই রথীন্দ্রনাথ ছিলেন সত্যই বহু গুণের আকর। বোনও তেমনি। এই বোন খুব বেশিদিন এজগতে থাকতে পারেননি। লেখার কাজও তাঁর অনেক করা হয়েছিল এমন নয়। সেই অল্প একটুর ভিতরেই ভাইয়ের জন্যে স্নেহ কী সুন্দর ভরে উঠেছে। ঠাকুর-বাড়ির এই মেয়ে, রবীন্দ্রনাথ-মৃণালিনীর জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরী-লতার বিয়ে হয়েছিল সেকালের প্রথায় কম বয়সেই। একেবারে বালিকা বয়সে যিনি ভাইকে জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানাবার জন্য ইংরেজিতে কবিতা লিখেছিলেন, ভাইকে ছেড়ে প্রথম ঘরকরনা করতে গিয়ে তাঁর মনে নিশ্চয় অনেক কথা জমে থাকবে, ভাই-দ্বিতীয়া মনকে উদ্বেল করবে, এই-ই স্বাভাবিক। ১৩০৮-এর শ্রাবণে, বিয়ের একমাস পরে, মাধুরীলতা যান মজঃফরপুরে। ১৩০৮ সালেরই সাতাশে কার্তিক বুধবার খাতায় লেখা হয়েছেঃ

ইমন-কল্যাণ । একতালা

সারা বর্ষ মোরা ভাই গণিয়াছি দিন তাই
এসেছে দ্বিতীয়া তিথি সুমঙ্গলে ভরা
ভগিনীর আনন্দেতে হাসিতেছে ধরা।
এই সুপ্রভাত লাগি বিভুপদে বর মাগি
সারাটি বরষ মোরা করেছি যাপন
এসেছে দ্বিতীয়া আজ করি মনোমত সাজ
হাসিছে প্রকৃতি রানী আনন্দ-মগন।
ভুলিয়া মধুর তান যমুনা বহিয়া যান
কোথায় কোথায় আজি কহ তা আমায়
বুঝেছি যমুনারানী করি কুলুকুলু ধ্বনি
চলিয়াছ ফোঁটা দিতে আপন ভ্রাতায়।
নহিলে বল গো কেন ছুটিছ আনন্দে যেন
প্রত্যেক তরঙ্গে তব আনন্দ উচ্ছ্বাস
তব অপেক্ষায় আজ দাঁড়াইয়া যমরাজ
ভীষণ মূরতি ছাড়ি প্রসন্ন সহাস।
দেখ আজ যমরাজ ছাড়িয়া ভীষণ সাজ
দাঁড়ান ভগিনী তরে সুসজ্জিত দেহে
কি শকতি ভগিনীর সুকোমল স্নেহে!
ভগিনী আসিয়া যবে ভ্রাতা ভালে ফোঁটা দিবে
উথলিবে দুটি হৃদে প্রীতি পারাবার
এ সুখের তুলা নাই তাই বসি ভাবি ভাই
কি আশ্চর্য দয়া এই বিশ্ববিধাতার।
জোড় করি দুটি কর বিধি পায়ে মাগি বর
সুখে কেটে যায় যেন আমাদের দিন
তব পদে বারবার করি বিভু নমস্কার
বর্ষে বর্ষে আসে যেন এ সুখের দিন।

[মূল খাতার পাঠ এবং প্রাসঙ্গিক আলোকচিত্র রবীন্দ্রভবনের সৌজন্যে প্রাপ্ত এবং বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে প্রকাশিত।]

(তেইশের পাতার পর)

কলের নৌকো তো ভেঙে চুরমার! এবারে এই পালের নৌকোয় সাবধানে বাড়ি ফিরুন!
আমার জন্যে ভাববেন না। জেনারেল ফার্নান্ডেজকে যে দমন করা গেছে, এইটে শুনলেই সরকার আমাকে বিস্তর পুরস্কার দেবেন।

ফার্নান্ডেজের দলের যারা বেঁচে আছে, তারাও আত্মসমর্পণ করেছে। যাক, আপনাদের কাছে আমি সারাজীবন কৃতজ্ঞ থাকব।

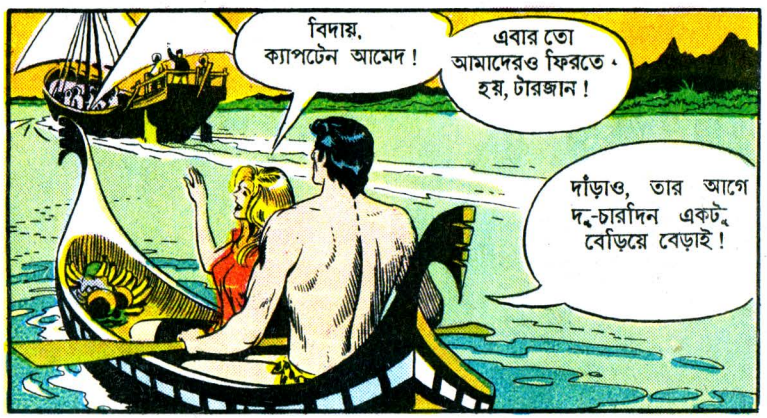
বিদায়, ক্যাপটেন আমেদ!
এবার তো আমাদেরও ফিরতে হয়, টারজান!
দাঁড়াও, তার আগে দু-চারদিন একটু বেড়িয়ে বেড়াই!

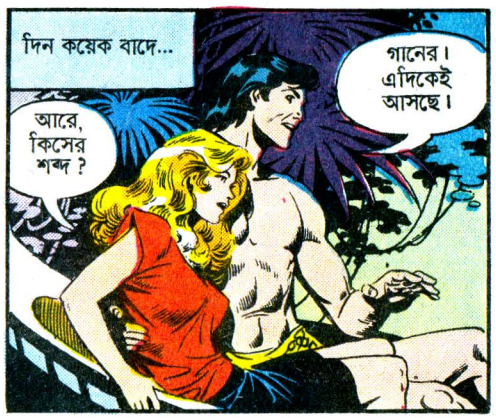
দিন কয়েক বাদে...
আরে, কিসের শব্দ?
গানের। এদিকেই আসছে।

কী ব্যাপার? ওরা কারা?

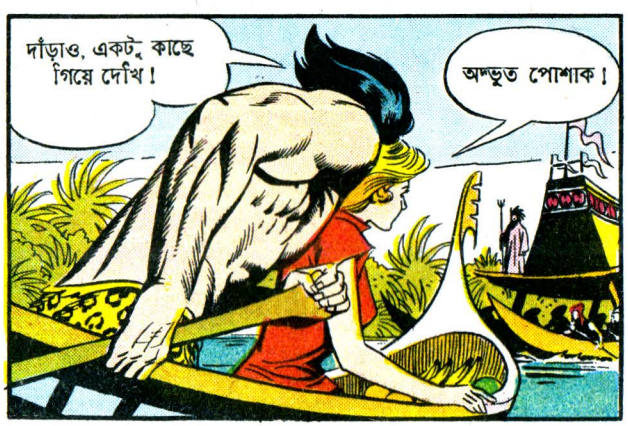
দাঁড়াও, একটু কাছে গিয়ে দেখি!
অদ্ভুত পোশাক!

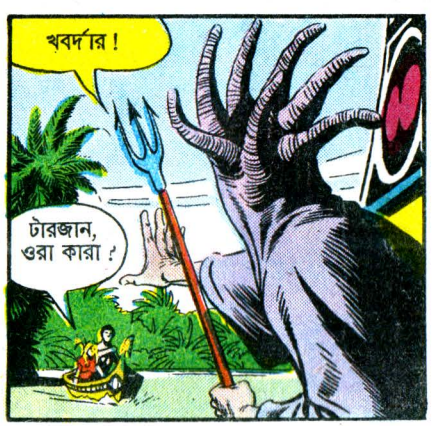
খবর্দার!
টারজান, ওরা কারা?

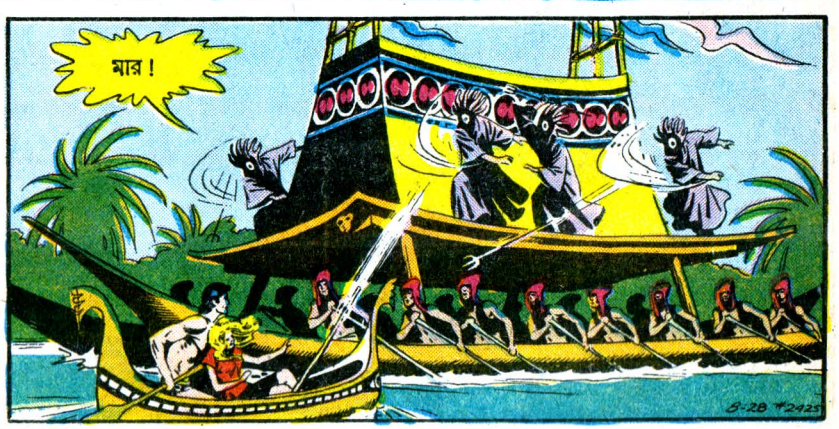
মার!

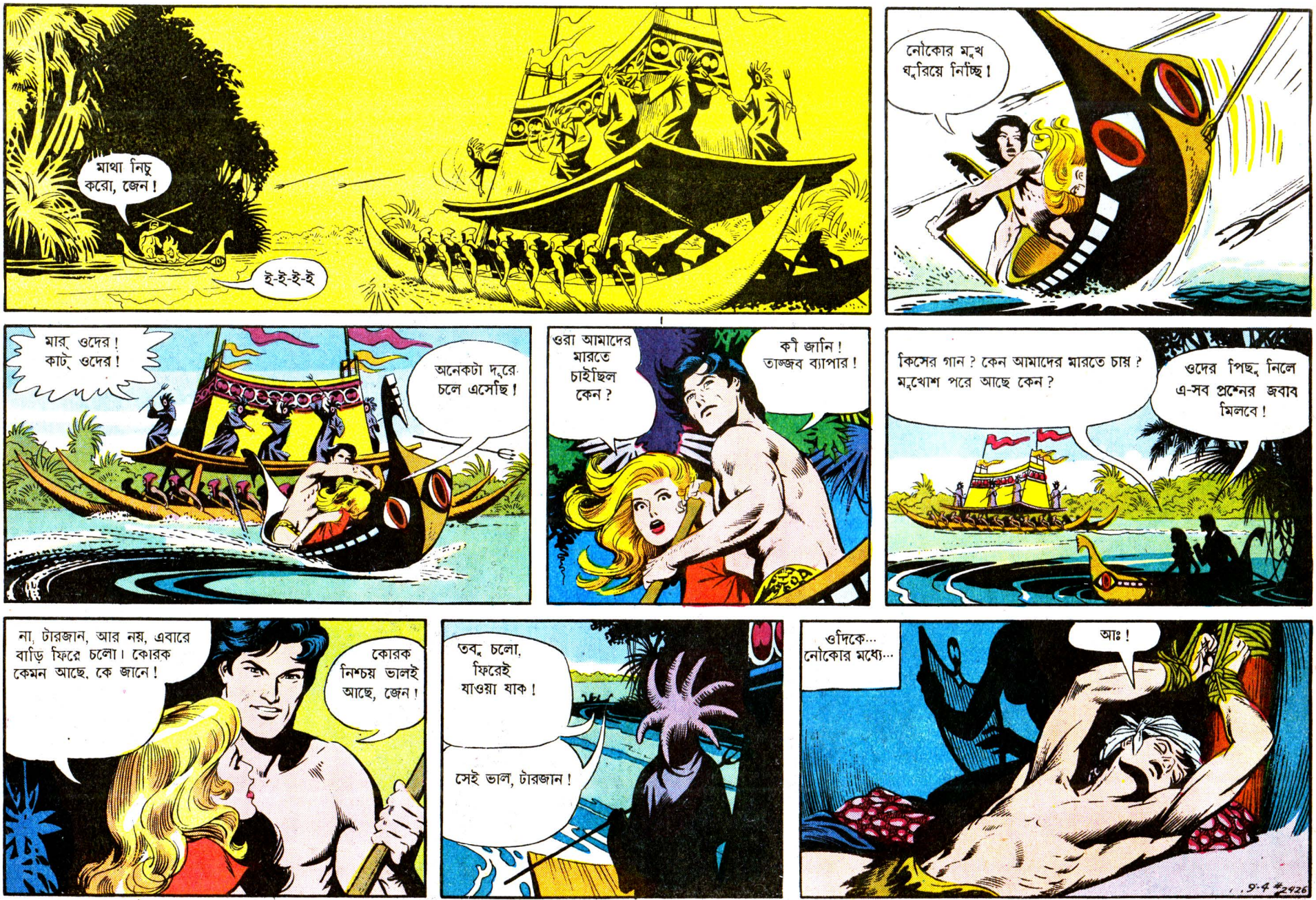

(এর পর আগামী সংখ্যায়)

আটখানা

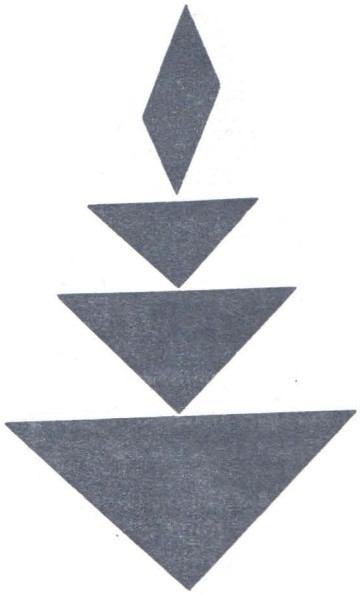

এ মাসটা কালীপুজোর মাস। চারিদিকে বাজি পোড়ানোর ধুম লেগে গেছে। পুজোর রাতে বাড়ির বারান্দায়, ছাতে জ্বলে সারি সারি প্রদীপ। দারুণ লাগে দূর থেকে দেখতে। এবারে আট টুকরো দিয়ে তৈরি করা হয়েছে বিরাট এক প্রদীপ, যা কিনা অনেক পুজো মণ্ডপে দেখা যায়। তোমাদের অনেকেই দেখেছ এই প্রদীপ, যারা দেখনি, তারা দেখে নিও। তারপর আট টুকরো দিয়ে বানাও ওই প্রদীপটা।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গতবারের সমাধান

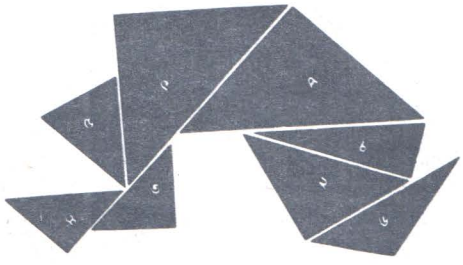

ধাঁধা

"এবারের ধাঁধাটা ধাঁধাও বটে, খেলাও বটে।" ছোটকা বলল।

সারা বিছানায় ছড়ানো দেশলাই কাঠি। হাত দিয়ে কয়েকটা গুনে-গুনে তুলে নিল ছোটকা। বাকী কাঠি-গুলো ভরে রাখল দেশলাইবাক্সে। তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, "খেলাটা নিজে খেল বরং আগে।"

দেশলাইকাঠি দিয়ে কী খেলা শেখায় ছোট্কা জানতে আমি চেয়ারটা এগিয়ে নিয়ে যাই বিছানার দিকে। ছোট্কা ততক্ষণে তিনটি গুচ্ছে সাজিয়ে ফেলেছে হাতের কাঠিগুলোকে।

একটি গুচ্ছে ১১টি কাঠি, একটিতে ৭টি, তৃতীয় গুচ্ছে রয়েছে ৬টি কাঠি। মোট চব্বিশটি কাঠি। খেলাটিতে জিততে হলে শেষ পর্যন্ত প্রতি গুচ্ছে রাখতে হবে ৮টি করে কাঠি। তার মানে, একগুচ্ছ থেকে অন্য গুচ্ছে কাঠি চালাচালি করতে হবে। এই চালাচালির সুযোগ মিলবে মাত্রই তিন বার। এ-ছাড়া চালাচালি করার একটা নিয়ম রয়েছে। সে নিয়মটি হল, একটি গুচ্ছে এক চালে ততগুলো কাঠিই যোগ করা যাবে, সেই গুচ্ছে তখন যে-কটি রয়েছে। অর্থাৎ ৬টি কাঠির গুচ্ছে এক চালে অন্য গুচ্ছ থেকে নিয়ে ৬টি কাঠিই ঠিক যোগ করা যাবে। কমও নয়, বেশিও নয়। সরাবার পর কোনো গুচ্ছে হয়ত পড়ে রইল ৩টি কাঠি, সেই গুচ্ছে চাল দিতে হলে তখন ৩টে কাঠিই ফের যোগ করা যাবে অন্য গুচ্ছ থেকে কাঠি নিয়ে। এই নিয়ম মেনে মাত্র ৩টি চালে তিন গুচ্ছে আটটি করে কাঠি রাখতে হবে শেষ পর্যন্ত। তাহলেই জিত।

খেলাটা খেলতে গিয়েই বুঝলাম, বেশ ধাঁধানো ব্যাপার। অর্থাৎ খেলাও বটে, ধাঁধাও বলা যায়। তোমরা চেষ্টা করে বলতে পারো কীভাবে দেওয়া যাবে তিনটি চাল?

এটাই প্রথম ধাঁধা।

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ একটি
মাথা পিছু চাঁদা ধরা হয়েছি
বাবাদের জন্য ৫০ পয়সা ম
ক্ষেত্রে চাঁদা ৩০ পয়সা হা
হয়েছিল সেই পিকনিকে।
দিয়েছে। মোট চাঁদা উঠেছে
করতে পারো ক'জন ছোট্ট
বাবা ও মা যোগ দিয়েছিলে

তৃতীয় ধাঁধা ॥ রাম শ্যা
রামের পিছনেই দাঁড়িয়ে। ক
পারে?

চতুর্থ ধাঁধা ॥ কোন্ সং
১১০, ৮৮, ৪৪০, ৬৬

গতবারের উত্তর ॥

(১) ৪৫ টাকা নিয়ে বা
মাসী।

(২) ঢালাঢালির পর্যায়
২৪ লিটার
ক। ২৪
খ। ১৩
গ। ১৩
ঘ। ১৮
ঙ। ১৮
চ। ২৩
ছ। ২৩
জ। ১২

৩। ২৫

৪। ফেব্রুয়ারি ছাড়া বা
রয়েছে।

সত্যসন্ধ

ছবি অহিভূষণ মালিক

স্কুলের পিকনিকে ছোটদের
ল নামমাত্র, ১ পয়সা করে।
থা পিছু হার, মায়েদের
রে। মোট ১০০ জন হাজির
প্রত্যেকে ঠিকঠাক চাঁদা
১০ টাকা। এ-থেকে বার
ছেলে মেয়ে ও ক'জন বয়স্ক
ন সেই পিকনিকে?
মের পিছনে দাঁড়িয়ে, শ্যামও
ী করে এমনটা সম্ভব হতে

াটি বেমানান?
৪৮, ৩৩

জারে বেরিয়েছিল সীমা-

নীচে দেখানো হল :

১১ লিটার	৫ লিটার
০	০
১১	০
৬	৫
৬	০
১	৫
১	০
০	১
১১	১

কী ১১টি মাসেই ৩০ দিন

কিসের ফটো

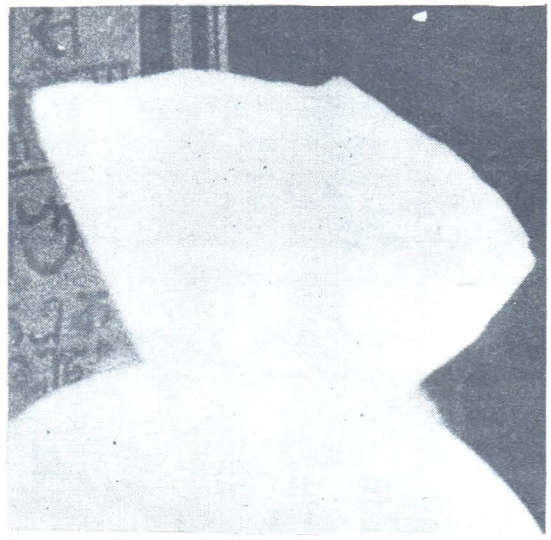

উত্তর আগামী সংখ্যায়/ফটো : তপন দাশ

গতবারে ছিল অন্ধকারে বেড়ালের চোখ

কিসের ছবি

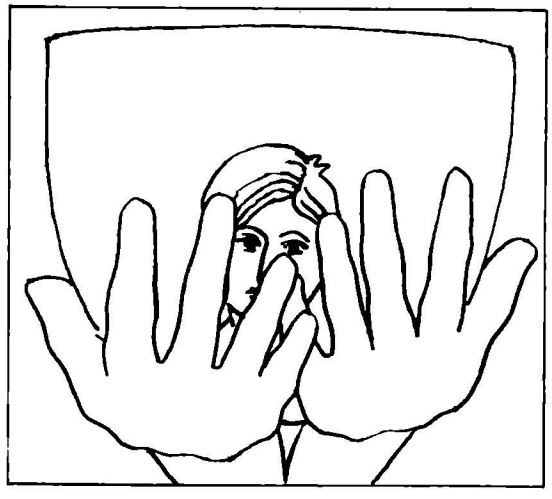

এবারের ছবিটা দেখে জাদুর দৃশ্য মনে হতে পারে। মনে হতে পারে, এক জাদুকর দুহাতে একটা কাঁচের পাত্র নিয়ে তাতে কারও মাথা ছোট্ট করে পুরে রেখে দিয়েছে! রূপকথায় এ ধরনের গল্প আছে প্রচুর। দেবতারা কাউকে কাউকে সুন্দর পাত্রে ভরে রাখতেন। কাউকে মনে হত বিশাল দৈত্য, আবার কাউকে মনে হত লিলিপুট। কিন্তু, এ ছবিটা কোনো ম্যাজিকের দৃশ্য নয়, বা রূপকথার গল্প নয়। এ একদম সত্যিকারের ঘটনা। একজন একটা কাঁচের পাত্র দুহাত দিয়ে ধরে আছে সামনের দিকে, ওরই মাথা কাঁচের ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে। মাথাটা হাত থেকে অনেকটা দূরে আছে, তাই মাথাটা অত ছোট দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে, কাঁচের পাত্রের মধ্যে আছে মাথাটা।

চিত্রপাল

শব্দ-সন্ধান

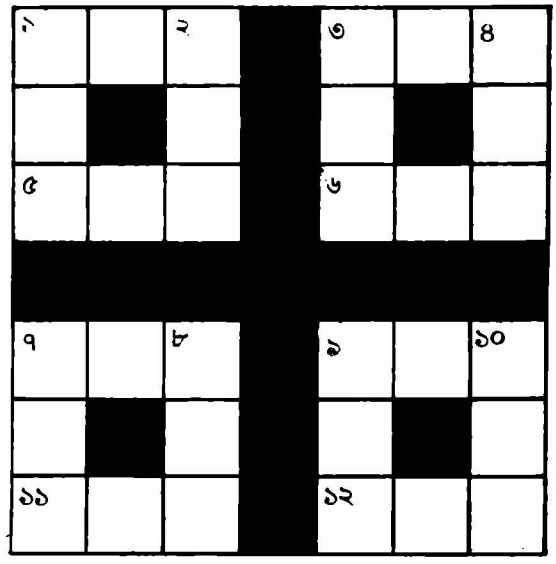

এবারে দেওয়া হল দুমুখো শব্দ-সন্ধান। তোমরা ভাবছ সেটা আবার কী বস্তু! ব্যাপারটা আর-কিছুই নয়, যে-সব শব্দ দিয়ে ছক পূরণ করবে সেগুলো হবে দুমুখো—মানে ওলটালেও তাই থাকবে।

সংকেত : পাশাপাশি : (১) সৈন্য, বিখ্যাত এক শহরও। (৩) কাটে, কিন্তু ব্যথা দেয় না। (৫) পদ্মেও থাকে গোলাপেও থাকে। (৬) না থাকলে সবই অন্ধকার। (৭) একজন বাঙালী কবি। (৯) ঘোড়ার দেখ্‌ভাল্‌ করে। (১১) এই জুতো পরলে পায়ে ফোস্কা পড়তে পারে। (১২) ব্যাকরণে পাবে।

উপর-নীচ : (১) বস্তা। (২) ভুঁড়োশেয়ালীর মাথায় কোন চাঁপা? (৩) পুত্র আর স্বর্গোদ্যান যদি এক হয়! (৪) নাচ। (৭) পদ্মের আর-এক নাম। (৮) নতি। (৯) অনেকে যা গ্রহণ করেন এবং অনেকে যে-রোগে মারা যান। (১০) খুব বেশি ভয়।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গতবারের সমাধান

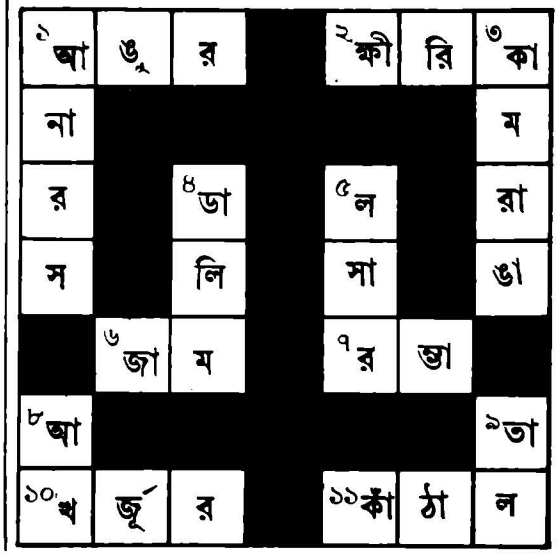

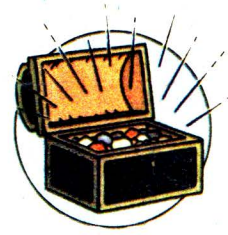

কফিখানা

সুপ্রভাত

আরে, বিল্ যে!

কেমন আছ জর্জ?
চলে যাচ্ছে। তুমি কী করছ?

ক্যাপ্টেন হ্যাডক আর টিনটিনদের 'সিরিয়াস' জাহাজে রাঁধুনীর কাজ করি। শিগগিরই সমুদ্রে বার হব।

আরে, তাঁরা তো আমার চেনা লোক। তা সমুদ্রে কি মাছ ধরতে যাচ্ছ নাকি?

না হে, গুপ্তধনের সন্ধানে যাচ্ছি।
তার মানে?

লাল বোম্বেটে র‍্যাকহ্যামের গুপ্তধন! ক্যাপ্টেন হ্যাডকের এক পূর্ব পুরুষ তাকে হত্যা করেছিলেন। জাহাজের নাম ইউনিকর্ন। তার হদিশ মিলেছে।

পুরনো চিরকুট থেকে জানা গেছে যে ইউনিকর্ন কোথায় ডুবেছিল। কিন্তু না, পরে সব বলব, লোকটা আমাদের কথা শুনছে!

লাল বোম্বেটের গুপ্তধন

সিরিয়াস জাহাজের আসন্ন সমুদ্রযাত্রা নিয়ে হরেক কল্পনা চলছে। এ-ব্যাপারে গোপনীয়তা রক্ষা করা হচ্ছে, কিন্তু আমাদের সংবাদদাতা জানতে পেরেছেন যে এই সমুদ্রযাত্রার উদ্দেশ্য আসলে গুপ্তধন উদ্ধার করা।

(এরপর চৌত্রিশের পাতায়)

স্যার রমেশ মিত্র গার্লস' হাই স্কুলের প্রধান-শিক্ষিকা কী বলেন

ভবানীপুরের রমেশ মিত্র গার্লস হাই স্কুলের প্রধান-শিক্ষিকা শ্রীমতী স্নেহময়ী ঘোষকে প্রথমেই প্রশ্ন করলাম ফেলের সংখ্যাধিক্যের কারণ সম্পর্কে। বললাম, গত মাধ্যমিক পরীক্ষায় এক লাখের উপর ফেল। এরা সকলেই পড়াশোনা করেনি, এমন তো নয়। লেখাপড়া করেও অনেক ছেলেমেয়ে ফেল করেছে। ভবিষ্যতেও করবে। তাহলে গলদটা কোথায় ?

শ্রীমতী ঘোষ বললেন, "পড়াশোনা করাটাই সব নয়। দেখতে হবে কে কী এবং কতটা 'নিতে পারছে'। উত্তরপত্রে লেখা উত্তরে সেটাই ধরা পড়ে। খারাপ উত্তর লিখে কি আর ভাল নম্বর পাওয়া যাবে? আপনিই বলুন।"

"খারাপ উত্তর বলতে আপনি ঠিক কী বোঝাতে চাইছেন?"

দু'দশকের প্রধান শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা নিয়ে শ্রীমতী ঘোষ বললেন, "যাতে কাম্য উত্তরের ধারে-কাছে না-গিয়ে বাজে বকা হয়। ভাষার উপর দখল থাকে না। বানান ভুল থাকে। উপযুক্ত শব্দের ব্যবহার থাকে না। জ্ঞানের গভীরতার পরিচয় মেলে না। আর যেখানে প্রকাশভঙ্গির ঋজুতা ও সাবলীলতা অনুপস্থিত।"

জেরা করতে থাকি। "ওগুলো এড়াতে পারলেই উত্তরকে ভাল বলা যাবে তো ?"

আমার ফাঁদে পা না দিয়ে হেসে শ্রীমতী ঘোষ বললেন, "তা বললে অর্ধসত্য বলা হবে মাত্র। ওগুলো এড়ানো হল উত্তরের নেতিবাচক দিক। পজিটিভ দিকটা হল, উত্তরের মধ্যে এমন একটা-কিছু উপস্থিত থাকবে, যা পরীক্ষককে তৃপ্তি দেবে। মনে হবে, অমন একটা খাতা দেখার জন্যেই তিনি এতকাল অপেক্ষা করছিলেন। ঐ একটা কিছুই হল উত্তরের অরিজিনালিটি বা স্বকীয়তা। ওটাকে বর্ণনা করা যায় না, বুঝতে পারা যায়।"

শ্রীমতী ঘোষ দুঃখ করছিলেন। ইদানীং আর ওঁদের স্কুলে তেমন ভাল ফল হচ্ছে না। অথচ আগে স্ট্যান্ড, স্কলারশিপ সবই হয়েছে। বললেন, "পড়াশোনা থেকে মন সরিয়ে নেবার মত আকর্ষণের অভাব আজকাল আর নেই। তার উপর কোর্স গেছে বেড়ে। আমরা শিক্ষক-শিক্ষিকারাও হয়ত কোনও কোনও সময় আমাদের কর্তব্য করে উঠতে পারি না। স্কুলে পড়ানো জিনিসগুলো মেয়ে বাড়িতে অভ্যাস করছে কিনা তা সব অভিভাবক দেখেন না। তাঁরা প্রধান-শিক্ষিকা বা শ্রেণী শিক্ষিকার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখুন।"

নিজের সাবজেক্ট ইংরেজি সম্পর্কে শ্রীমতী ঘোষের বক্তব্যঃ বাইরের ষাট নম্বরকে অবহেলা করে শুধু চল্লিশ নম্বরের টেক্সট পড়াটা বিরাট বোকামি। অথচ, একটু বুদ্ধি খরচ করে সাবজেক্টটা পড়লে ষাট বা তার বেশি নম্বর পাওয়া মোটেই কঠিন হয় না। সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা টেক্সট বইয়ের উপর অনাবশ্যক রকমের বেশি জোর দিয়ে চল্লিশের মধ্যে দশও পায় না, আর বাইরের অংশ ঠিকভাবে না পড়বার জন্যেই ষাটের মধ্যে কুড়িও পায় না। বাইরের অংশটাকে ভয় করে এড়িয়ে না গেলে নম্বর ও জ্ঞান দুই বাড়ত।

বাংলা সম্পর্কে উনি বললেন, "এক্ষেত্রে সমস্যাটা অন্যরকম। হয়তো 'গেঁয়ো যোগী' বলেই বাংলা ভিখ পায় না। সবটা সম্ভ্রম ইংরেজিই আদায় করে নেয়। সত্যি কথা বলতে কী, বিষয়টা যথেষ্টই শক্ত। ভাল করতে হলে প্রচুর বই পড়া দরকার। বাইরের বই, রেফারেন্স বই। স্টাইলের উৎকর্ষের জন্যে বঙ্কিম-শরৎ-রবীন্দ্রনাথ আর অতি আধুনিক লেখকদের রচনা পড়া দরকার। ব্যাকরণ রচনাতেও জোর দেওয়া উচিত। কিন্তু দেখা যায়, ছেলে-মেয়েরা ব্যাকরণকে ভয় করে না-বুঝে মুখস্থ করছে।

"ভয় ! এই ভয়ই সবচেয়ে ক্ষতি করে। অজ্ঞতা বা ভুল শেখার চেয়ে এটা কোনও অংশে কম নয়। অঙ্কেও এই ভয়েরই প্রতিফলন দেখি। অথচ রোজ পাটীগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি থেকে পাঁচটি করে অঙ্ক অনুশীলন করলেই তো কত কাজ হয়।"

বিজ্ঞান-বিষয়গুলি নিয়ে শ্রীমতী স্নেহময়ী ঘোষ বললেন, "একথা ঠিকই যে, বিষয়গুলিতে অঙ্কের মতই নম্বর ওঠে। কিন্তু সেই নম্বর পাবার জন্যে যা-যা করা উচিত, তা করতে হবে। নিজে-নিজেই প্রশ্ন করে পড়তে হবে। শুধু পরীক্ষার উত্তরে ছবি আঁকলেই চলবে না, বাড়িতে পড়ার সময়ও আঁকতে হবে। সংজ্ঞাগুলো না বুঝে মুখস্থ করার চেয়ে ভেঙে-ভেঙে বুঝে পড়বে।

"ছাত্রছাত্রীদের কাছে সংস্কৃত নীরস, তার আকর্ষণ কম। অথচ মোট নম্বরকে ভাল করতে সংস্কৃতের অবদান অপরিসীম। আর কিছু না করুক, ছেলেমেয়েরা 'হেল্পস টু দি স্টাডি' বইটি মন দিয়ে পড়লে সে-পরিশ্রম সুফল ফলাতে বাধ্য।"

ভূগোলের ব্যাপারে ম্যাপের সাহায্য নিয়ে পড়ার ও লেখার

উপর জোর দিলেন শ্রীমতী ঘোষ। তাঁর ঘরে ঐ সময় ভূগোলের শিক্ষিকা শ্রীমতী শুক্লা বসু ছিলেন। তিনি তো ম্যাপ-বই ছাড়া কাউকে ক্লাসে ঢুকতেই দেন না। শ্রীমতী বসু বললেন, ভূগোলে ভাল করার জন্যেও অন্তত ভারত সম্বন্ধে ভাল ধারণা লাভ করতে হবে। তা ছাড়া, সিলেবাসে দেওয়া না থাকলেও প্রাকৃতিক ভূগোল সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। "হিমবাহ ও তার কাজ সম্পর্কে না জানলে হিমালয় অঞ্চলের ভৌগোলিক বিবরণ পড়তে অসুবিধা হতে বাধ্য।" আর-একটা কথা। ভূগোল পড়তে হবে অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে, বিশ্লেষণ করে। একটা বিশেষ কৃষিজাত দ্রব্য কেন এক জায়গায় উৎপন্ন হয়, আর-এক জায়গায় কেনই বা হয় না—এইরকম করে জানতে ও বুঝতে হবে।

আনন্দমেলা শ্রীমতী ঘোষের বাড়িতে নিয়মিত যায়। লেখাপড়া বিভাগ ও প্রধান পরীক্ষকদের পরামর্শের অংশগুলি ছাত্রছাত্রীদের ভাল করে পড়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করবে বলেই তাঁর বিশ্বাস।

কীভাবে তৈরি হচ্ছে ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট গার্ল

ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট গার্ল শর্মিলা কুণ্ডু মেয়েটি শান্ত অথচ সপ্রতিভ। শর্মিলারা মানে শর্মিলার ঠাকুরমা, মা, তিন দাদা, দুই বোন থাকে স্কুলের খুব কাছেই—চক্রবেড়িয়া রোড সাউথ-এ। ওকে কখনও মেজদা, কখনও বা পিসিরা পড়া বুঝিয়ে দেন। পিসিরা দুজনেই শিক্ষিকা। শ্রীমতী চিত্রা কুণ্ডু হাওড়ার একটি স্কুলে আছেন আর শ্রীমতী শান্তি কুণ্ডু হুগলীর বিখ্যাত বিনোদিনী বালিকা বিদ্যালয়ে। কাজেই শর্মিলার গৃহশিক্ষক দরকার হয় না।

সেই শিশুশ্রেণী থেকে পাড়ার স্কুলটিতে পড়ছে শর্মিলা। ফার্স্ট হতে আরম্ভ করেছে ফাইভ থেকে। ফাইনালে কী হবে ? স্ট্যান্ড করতে পারবে ? মৃদু হেসে বলল, অত আশা করি না, তবে ভাল রেজাল্ট করবই।

এই আত্মপ্রত্যয়ে মুগ্ধ হলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, "দিনে কতক্ষণ পড় ?"

"স্কুলের সময় বাদ দিয়ে সাত ঘন্টার মত।"

শর্মিলার ইচ্ছা ডাক্তারি পড়া। বলা বাহুল্য ওর প্রিয় সাবজেক্ট লাইফ সায়েন্স। ওতে স্কুলের বই (ডঃ তারকমোহন দাশ) ছাড়া ও ডাঃ অজিত গাঙ্গুলী, কুণ্ডু-দাশ-কুণ্ডু ও অধ্যক্ষ হরিদাস গুপ্ত-র বই তিনটি পড়ে। অতিরিক্ত বিষয় বায়োলজিতে পড়ে বুকলিস্টের রবীন্দ্রনারায়ণ পাল, ছাড়া ওর প্রিয় বই—অজিত গাঙ্গুলী ও শিলাদ্রি গুপ্ত।

অবশ্য লাইফ সায়েন্স প্রিয় বলে ফিজিক্যাল সায়েন্সকে যে শর্মিলা অবহেলা করে, তা নয়। ক্লাসের বই (বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ) ছাড়াও ভাল ভাল বই পড়ে—সমর গুহ, চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত, লাডলি মিত্র।

শর্মিলা স্বীকার করল যে, অঙ্ক নিয়ে ও উঠে-পড়ে লেগেছে। ওটাই ওর দুর্বল-

তম জায়গা। অথচ ভাল ফল করতে গেলে অঙ্কে ন'য়ের ঘরে নম্বর পেতেই হবে। তাই রোজই ও অঙ্ক প্র্যাকটিস করে স্কুলের বই (কেশব নাগ) ছাড়াও কে পি বসু, মৃদুল সেনের বই এবং টেস্ট পেপার্স থেকে। ভূগোল আর ইতিহাসেও শর্মিলা ভাল বই কিছুই বাদ দেয় না। লোকেশ চক্রবর্তী, ডঃ কিরণ চৌধুরী, ডঃ অতুল-চন্দ্র রায়—সবই ওর আছে। ক্লাসে পড়ানো হয় বন্দ্যোপাধ্যায়—শ্যাম আর ডঃ নিমাই-সাধন বসু-র বই।

সংস্কৃতে শর্মিলা টেক্সট ও গ্রামার-ট্র্যানস্লেশন দু'দিকেই সমান জোর দেয়। হেল্পস টু দি স্টাডি, টেস্ট পেপার্স ব্যবহার করে। সেইরকম, বাংলা টেক্সটটাও ও খুব মন দিয়ে পড়ে ফাইনালের মূল এবং কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষার প্রশ্ন আর টেস্ট পেপার্স-এর প্রশ্নগুলি তৈরি করে। রচনায় ওর প্রিয় বই পি আচার্য'র রচনা-বিচিন্তা। অবশ্য স্কুলের বই বা অন্য ভাল বই পেলেও পড়ে। ব্যাকরণে ? "সূত্র মুখস্থ করি।" নির্বাচিত বইটি (বামনদেব চক্রবর্তী) ও ব্যবহার করে।

কারও-কারও মত শর্মিলাও বিশ্বাস করে, বড়-বড় প্রশ্নের উত্তর তৈরি করলেই ছোট-ছোটগুলি আপনা-আপনিই হয়ে যায়। লেখা উত্তর ও বাড়িতেই হোক আর স্কুলেই হোক, কাউকে দেখিয়ে নেয়। যেমন দেখিয়ে নেয় ট্র্যানস্লেশন। এ ছাড়া টেস্ট পেপার্স, রেন-মার্টিন ও নেসফিল্ডের বই ব্যবহার করে। শেক্সপিয়ার, ডিকেন্স পড়ে।

ওঁদের প্রভাবে কিনা জানি না, শর্মিলা লেখে। কবিতা। একখানা উপন্যাসও লিখেছে। ওর আরও অনেক গুণ আছে। নৃত্যপটীয়সী শর্মিলা বাণী বিদ্যাবীথি-র "নৃত্যশ্রী"। ইন্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটির দলেও ও আছে।

আনন্দমেলার 'লেখাপড়া' বিভাগ কেমন লাগে ? "ঐ জন্যেই তো আনন্দমেলা পড়ি!" এছাড়া পুজাবার্ষিকী আনন্দ-মেলায় প্রকাশিত প্রধান পরীক্ষকদের মূল্যবান প্রবন্ধগুলি সবই ওর সংগ্রহে আছে।

—রঞ্জিতকুমার ঘোষ

ফোটো তপন দাশ

(একত্রিশের পাতার পর)

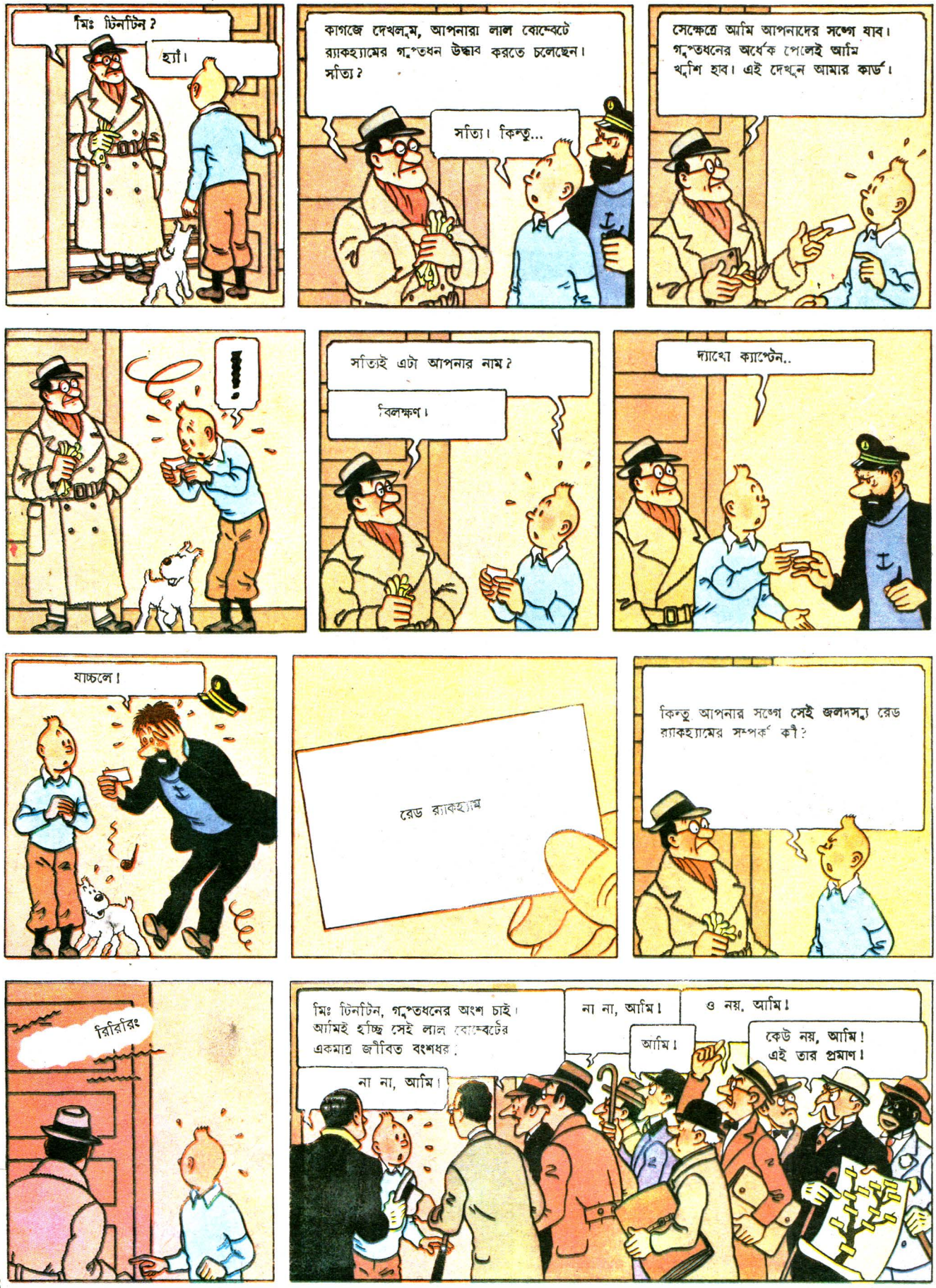

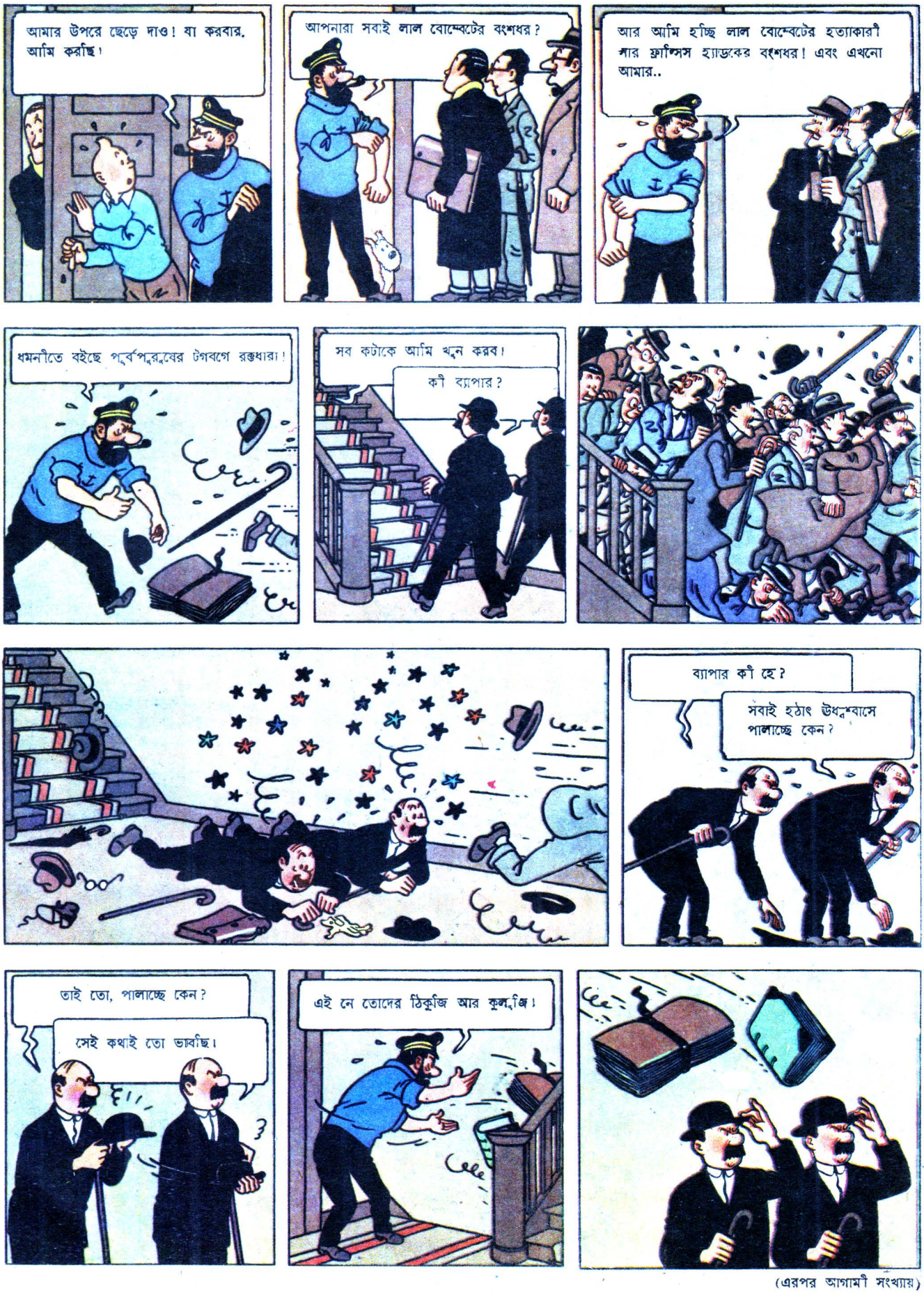

(এরপর আগামী সংখ্যায়)

উপন্যাস

বন্ধ ঘরের আওয়াজ

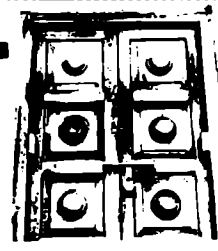

সমরেশ বসু

আগে যা ঘটেছে ;

গোগোল আজ ইস্কুল থেকে বাড়ি ফিরেই মায়ের কাছে শুনল, গতকাল সকালে ডাবুদা সেই যে খেয়ে ইস্কুলে বেরিয়েছিল, আর ফেরেনি। পুলিসকে খবর দেওয়া হয়েছে। গোগোল নিজেই কোনোরকমে একটু খাবার খেয়ে আটতলায় ডাবুদাদের ফ্ল্যাটে গিয়েছিল। ডাবুদাদের ফ্ল্যাটে তখন দুজন পুলিস অফিসার ছাড়াও, ফ্ল্যাট বাড়ির অনেকে ছিলেন। পাঁচতলা থেকে আটতলায় ওঠবার সময় লিফট্ যখন নীচে নামছিল, তখন গোগোল একজন অচেনা লোককে লিফ্টের খাঁচার মধ্যে এক পলকে দেখতে পেয়েছিল। এক জোড়া গোঁফ, জ্বলজ্বলে চোখ, ও সাদা-কালো ডোরাকাটা শার্ট, কালো ট্রাউজার, অনেকটা যেন ড্রাইভারের মতো দেখতে। গোগোল দেখল, ডাবুদার মা-দিদিরা কান্নাকাটি করছেন। ও জানতে পারল পুলিস ডাবুদার কোনো খোঁজই পায়নি। ভারতবর্ষের সব বড় শহরে স্টেশনে খবর পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফ্ল্যাটেরই এক বাসিন্দা হনুমন্তিয়াজীর ধারণা, ডাবুদাকে কেউ ভুলিয়ে ভালিয়ে কোথাও নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রেখেছে, এইবার ডাবুদার বাবা নীহারবাবুর কাছে টাকা দাবি করবে। এই ভয়ংকর খবরটা নীচে বন্ধুদের দেবার জন্য গোগোল সিঁড়ি দিয়ে ছুটে নামার সময়ে শুনতে পেল, মহেশানিদের খালি ফ্ল্যাটের বন্ধ ঘরের দরজার ভিতরে কেউ "এই চুপ" বলে উঠল। নীচে গিয়ে বন্ধুদের পুলিস অফিসারদের আর হনুমন্তিয়াজীর সংবাদ দিল। জর্জ, টুকাই, গোগে, সুমিত, পারভেজ, এই কজন বন্ধুর সঙ্গে ডাবুদার হারিয়ে যাওয়ার বিষয়ে নানান আলোচনার মধ্যেই, পুলিস অফিসাররা নেমে গেলেন। রাস্তার মোড়ে ব্যান্ড-মাস্টারের ঘরে পিলু আর জ্যাকির মতো বাজে ছেলেদের সঙ্গে ডাবুদার মেলামেশার বিষয়টাও ওরা আলোচনা করল। এই সময়েই সেই ড্রাইভারের মতো দেখতে লোকটাকে আবার লিফ্টে করে সাততলায় উঠে যেতে দেখা গেল, আর গোগোলের মনে পড়ে গেল, মহেশানিরা তো সবাই দিল্লি চলে গিয়েছেন, তবে ভিতরে কথা বলছিল কে? ভেবেই ও ওপরে ছুটে গেল। একটা সাপের হিস্-স্-স্ শব্দ ছাড়া আর কিছুই বন্ধ দরজার ভিতরে শুনতে পেল না। তখনই পিছনে শব্দ পেয়ে আটতলায় উঠে দেখল, লিফ্টের সামনে সেই ড্রাইভারের মতো লোকটা দাঁড়িয়ে আছে। গোগোল সেই লোকটার সঙ্গেই আবার নীচে নেমে এসে জর্জকে সব কথা বলল। জর্জের ধারণা, মহেশানিদের ফিটফাট পোশাক পরা কাজের লোক চান্দা সিং ফ্ল্যাটের ভিতরে রয়েছে। পরীক্ষা করার জন্য ওরা সিকসথ্ ফ্লোরে উঠে মহেশানিদের কলিং বেল টিপল, কোন শব্দ হল না। গোগোল ইয়েল লকের ছিদ্রে উঁকি দিয়ে দেখল, আগের মতো অন্ধকার নেই, ভিতরে একটা কম পাওয়ারের আলো জ্বলছে। তারপরেই হঠাৎ ছিদ্রটা ঢাকা পড়ে গেল। কী করে? ভাবতেই লিফট্ উঠে আসার শব্দ পাওয়া গেল। গোগোল আর জর্জ সিঁড়ির নীচে ছুটে কয়েক ধাপ নেমে গেল। তারপরে—

৬

গোগোল ফিস্‌ফিস করে বলল, "তার মানে, ভেতরের পর্দাটা কেউ তুলে ধরেছিল তারপর ঝপ্ করে ফেলে দিল।"

জর্জ গোগোলের কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারল না। কারণ ও তো ইয়েল লকের ছিদ্রে একবারও চোখ লাগিয়ে দেখেনি। বলল, "তোর কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। ভেতরের পর্দা তোলা আর ফেলে দেওয়ার মানে কী?"

গোগোল ঠোঁটে আঙুল রেখে জর্জকে জোরে কথা বলতে বারণ করল, ফিসফিস করে বলল, "লিফট্ উঠে যাক, তারপরে লকের ফুটোয় উঁকি দিয়ে দেখে তোকে বলব।"

গোগোলের কথা শেষ হবার আগেই, লিফট্ সিকসথ ফ্লোরে দাঁড়িয়ে পড়ার শব্দ হল। তারপরেই খাঁচার দরজা খোলার শব্দ। দুজনেই ওপরের দিকে তাকাল। লিফট্ নেমে যাওয়ার শব্দও শোনা গেল। কিন্তু আর কোনো শব্দ আসছে না। নিশ্চয়ই কোনো ফ্ল্যাটে কেউ এসেছে? পায়ের শব্দও শোনা যাচ্ছে না কেন? গোগোল আর জর্জ একবার চোখাচোখি করল। জর্জ মাথা নেড়ে ওপরে ওঠার ইশারা করল। তখনই গোগোলের চোখে পড়ল, মহেশানিদের বন্ধ দরজার কাছে একটা মানুষের ছায়া পড়ল। ও জর্জের হাত চেপে ধরল, আর আরো কয়েকধাপ নীচে নেমে সিঁড়ির বাঁকে দাঁড়াল। জর্জও ছায়াটা দেখেছে।

ছায়াটা আস্তে আস্তে মহেশানিদের বন্ধ দরজার সামনে এগিয়ে আসতে লাগল, আর ছায়াটা দরজার গায়ে বড় হয়ে উঠল। গোগোল জর্জকে নিয়ে আরো কয়েক ধাপ নীচে নেমে, আড়াল থেকে কোনরকমে কেবল চোখ দুটো তুলে দেখতে চেষ্টা করল। কিন্তু ওরা বুঝতে পারল না, ওদের দুজনের জোড়া মাথাও সিঁড়ির বাঁকে দেখা যাচ্ছে। ছায়াটা দরজার সামনে মানুষের আকারে দেখা দিল। গোগোল দেখল, সেই অচেনা লোকটা। এক জোড়া গোঁফ, জ্বলজ্বলে দুটো চোখ, সাদা-কালো ডোরাকাটা শার্ট কালো ট্রাউজার। ড্রাইভারের মতো দেখতে। অচেনা লোকটা মহেশানিদের ফ্ল্যাটের দরজায় কেন? গোগোল তো এর আগে লোকটাকে সেভেনথ্ ফ্লোরে—মানে, আটতলায় লিফ্টের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল। তখন ভেবেছিল, লোকটা আটতলার কোন ফ্ল্যাটে নতুন এসেছে। একসঙ্গে লিফ্টে নামার সময় লোকটাকে দেখে ভয়ে এমন গা ছমছম করছিল, জিজ্ঞেস করতে পারেনি সে কোন ফ্ল্যাটে এসেছে। এখন কিনা লোকটা মহেশানিদের ফ্ল্যাটের দরজার সামনে।

লোকটা কলিংবেলের দিকে হাত না তুলে, দরজায় টোকা মারবার আগে, হঠাৎ ডান দিকে একবার ফিরে তাকাল। তাকিয়েই হাতটা নামিয়ে নিল, আর সিঁড়ির দিকে ঝুঁকে পড়ল। তার মানে গোগোল আর জর্জকে দেখতে পেয়েছে। কথাটা ভেবেই, গোগোল জর্জকে হাত টেনে, সিঁড়ির বাঁকে তাড়াতাড়ি নীচে নামতে নামতে বলল, "চলে আয় জর্জ, লোকটা আমাদের দেখতে পেয়েছে।"

লোকটা যে কে, জর্জ তখনো বুঝতে পারেনি, কিন্তু লোকটার আস্তে আস্তে মহেশানিদের বন্ধ দরজার সামনে এগিয়ে, টোকা মারতে গিয়ে থেমে যাওয়াটা ভারি অদ্ভুত আর সন্দেহজনক। লোকটা কি ওদের পিছনে পিছনে আসছে? জর্জ পিছন ফিরে দেখল। না, লোকটা আসছে না। ও থেমে পড়ে বলল, "এই গোগোল, পালাচ্ছিস কেন? লোকটা তো আমাদের তাড়া করছে না।"

জর্জ হাত টেনে ধরায়, গোগোলকে থামতেই হল। যদিও লোকটার বিষয়ে ওর মনে একটুও বিশ্বাস নেই, বরং ভয় আছে। প্রথম দেখেই লোকটাকে ওর ভাল লাগেনি। বিশেষ করে, আটতলা থেকে একসঙ্গে লিফ্টে নামার সময়, লোকটার সেই বাঘের মতো চাউনি মনে পড়লে, এখনো গা ছমছমিয়ে উঠছে। ও বলল, "এই তো সেই লোকটা, যার কথা তোকে বলেছিলাম। লোকটা খুব সাংঘাতিক, আমি তোকে বলে দিচ্ছি।"

জর্জ জিজ্ঞেস করল, "কী করে বুঝলি?"

গোগোল মাথা ঝাঁকিয়ে বেশ জোরের সঙ্গে বলল, "এক-একজনকে দেখে আমি ঠিক বুঝতে পারি। লোকটা তো আমাদের এই বিল্ডিং-এ অচেনা। ও এত ওপর-নীচে ঘুরে বেড়াচ্ছে কেন? আর এখন মহেশানিদের দরজায় ওভাবে দাঁড়িয়ে হাত তুলে থেমেই বা গেল কেন?"

গোগোলের কথা শেষ হতে না হতেই ওর কানে এল, ওপরতলায় কেউ দরজায় হাত দিয়ে ঠক্‌ঠক্‌ করছে. আর গলা চড়িয়ে হিন্দীতে ডাকছে "এ চান্দা, চান্দা! তুম্‌ অন্দর মে হ্যায় ইয়া নহি হ্যায়? এ চান্দা, চান্দা!"

তার মানে লোকটা মহেশানিদের দরজা ধাক্কিয়ে চান্দা সিংকে ডাকছে? গোগোল একেবারে হতভম্ব হয়ে জর্জের দিকে তাকাল। জর্জও গোগোলের দিকে অবাক চোখে তাকাল, বলল, "সেই লোকটাই চান্দা সিংকে ডাকছে বলে মনে হচ্ছে না?"

গোগোল বলল, "তাই তো মনে হচ্ছে। তাহলে লোকটা কে?"

জর্জ জবাব দিল, "যে-ই হোক, ওই লোকটা চান্দা সিংকে ডাকছে।"

গোগোল খানিকটা যেন বোকার মতো নিজেকেই জিজ্ঞেস করল, "তা হলে তখন লোকটাকে আটতলায় লিফ্‌টের কাছে দেখেছিলাম কেন?"

জর্জ ওর বড়-বড় দাঁতে হেসে বলল, "এত কথা তোর জানবার দরকার কী? তুই তো লোকজন দেখে অনেক-কিছু ভাবিস। চল না, সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে তোর সাংঘাতিক লোকটাকে দেখেই আসি। এখনো তো লোকটা দরজা ধাক্কিয়ে চলেছে। আমার কী মনে হচ্ছে জানিস?"

গোগোল জিজ্ঞেস করল, "কী?"

"চান্দা সিং ফ্ল্যাটের সব সুইচ্‌ অফ্‌ করে দিয়ে কোথাও বেরিয়ে গেছে।" জর্জ বলল, "লোকটা চান্দা সিংয়ের কাছে এসেছে। কলিং বেল বাজিয়ে আওয়াজ না পেয়ে, এখন দরজা ধাক্কা দিয়ে ডাকাডাকি করছে।"

গোগোল মনে-মনে ভাবল, তাই কী? ওর মাথায় হুড়মুড় করে অনেকগুলো ভাবনা নেমে এল। কিন্তু জর্জ গোগোলকে আর কিছু ভাবতে না দিয়ে ওর হাত ধরে টেনে ওপরে উঠতে উঠতে বলল, "চল, ব্যাপারটা দেখেই আসি।"

জর্জ গোগোলের সঙ্গে ওপরে উঠে এল। লোকটা তখনো দরজা ধাক্কাচ্ছে। গোগোল আর জর্জের দিকে তাকিয়ে লোকটা হেসে বলল, "চান্দা সিং ভারী আজব মানুষ আছে। এত বেল টিপছি, দরজায় ঘা মারছি, চিল্লাচিল্লি করে ডাকছি, কোন জবাব দিচ্ছে না।" বলতে বলতেই লোকটার সেই জ্বলজ্বলে চোখে যেন বিস্ময় ফুটে উঠল। গোগোলের দিকে তাকিয়ে বলল, "আরে খোকা, থোড়া টাইম আগে তুমি আমার সাথে লিফটে নীচে উতার গেছিলে না?"

গোগোল মুখে কিছু না বলে, ঘাড় ঝাঁকিয়ে জানাল, লোকটা ঠিকই বলেছে। লোকটার জ্বলজ্বলে চোখ দুটো এখন মোটেই বাঘের মতো দেখাচ্ছে না। গোঁফজোড়া হাসিটাও প্রায় তিতুদার মতোই যেন। গোগোলের ঠোঁটের ডগায় জিজ্ঞাসা এসে গিয়েছিল। তার আগেই লোকটি জিজ্ঞেস করল, "তোমরা কি এই বিল্ডিংমে থাকো?"

জর্জ কিছু বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই গোগোল জবাব দিল, "হ্যাঁ।"

লোকটা ঘাড় ঝাঁকিয়ে-ঝাঁকিয়ে হাসল, আবার জিজ্ঞেস করল, "থোড়া আগে আমি যব্‌ এ-দরজার কাছে এলাম, তোমরা সিঁড়ি থেকে আমাকে দেখছিলে, না?"

গোগোল আর জর্জ চোখে-চোখে তাকাল, আর দুজনেই একসঙ্গে ঘাড় ঝাঁকিয়ে জানাল, হ্যাঁ। কিন্তু লোকটা জিজ্ঞেস

করল না, কেন গোগোলরা তাকে ও-ভাবে দেখছিল। বরং হেসে-হেসে গল্প জমাবার মতো বলল, "চান্দা সিংকে তোমরা চেন?"

গোগোল আর জর্জ দুজনেই ঘাড় কাত্ করে জানাল, চেনে। লোকটা জিজ্ঞেস করল, "মহেশানি সাহেবের ফ্ল্যাট তো এটাই আছে? চান্দা সিং এই ফ্ল্যাটমে-ই কাজ করে তো?"

গোগোল আবার মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "হ্যাঁ।"

লোকটা একদম বেকুফের মতো হেসে, দু হাত নেড়ে বলল, "আর আমি একঘণ্টার ওপর তামাম্ বিল্ডিং ঢুঁড়ে বেরাচ্ছি কাঁহা মহেশানি সাহেবের বিল্ডিং, আর কাঁহা চান্দা? আভি তো নীচে এক সাহেব আমাকে এই ফ্ল্যাটের ঠিকানা বাত্লে দিলেন। তো ঠিকানা মিলল, চান্দাকে মিলছে না। দরজার ঘন্টি বাজছে না দরজায় এত আওয়াজ করছি। এত বোলাচ্ছি। চান্দার কোন জবাব নেই। সায়েদ ও ঘরেই নেই, বাহার নিকাল গেছে।"

গোগোল কিছু বলবার আগেই জর্জ বলে উঠল "তাই হবে। চান্দা সিং কি জানে আপনি আসবেন?''

লোকটা বলল, "জরুর। চান্দা আমাকে চার সাড়ে-চার বাজে আসতে বলেছেন, আর সেই থেকে আমি তাকে ঢুঁড়ে বেড়াচ্ছি।"

গোগোল জিজ্ঞেস করল, "চান্দা সিং আপনার কেউ হয়?"

লোকটা গোঁফজোড়া ছড়িয়ে হেসে বলল, ''হ্যাঁ, চান্দা তো আমার ভাগিনা আছে—আমার বড় বহিনের বড় লেড়কা। আমি ওর মামা আছি। ওয়েলেসলি স্ট্রিটমে আমি থাকি।''

গোগোল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "আপনি আর কখনো চান্দা সিংয়ের কাছে আসেননি?''

চান্দা সিংয়ের মামা ঘাড় নেড়ে বলল, ''কভি না। চান্দা দু-দিন আগে আমাকে বলে এল, ওর মালিক দিল্লি চলে গেছে, ও একলা আছে। মামা ভাগিনা থোরা গপ্সপ্ হবে, তাই আমিও আমার মালিকের কাছ থেকে এক বেলা ছুটি নিয়ে এলাম। তো ব্যাটা চান্দাই তো ঘরে নেই।'' লোকটা হেসে উঠল।

জর্জও হেসে উঠে বলল, ''চান্দা সিং ভুলেই গেছে।''

চান্দার মামা বলল, ''ওইসাই হবে, ব্যাটা আমার একবেলার ছুটি বরবাদ করে দিল।''

গোগোল একটুও সময় না দিয়ে জিজ্ঞেস করল, ''আপনি কী কাজ করেন?''

লোকটা হেসে উঠে বলল ''কেন খোকা, এত জেরা করছ কেন বাবা? আমি গরিব মানুষ, গাড়ি চালাই।''

গোগোলের মনটা চমকে উঠল। ও ঠিক ভেবেছিল, লোকটাকে দেখে ড্রাইভারের মতো মনে হয়। কথাটা মিলে যেতেই ও জর্জের দিকে তাকাল। জর্জও ওর দিকে তাকাল। চান্দার মামা ওদের চোখাচোখি করতে দেখে, একটু যেন অবাক হয়ে বলল, "কেন খোকা, গাড়ি চালানো খারাপ কাজ আছে?"

জর্জ কিছু বলবার আগেই গোগোল বলে উঠল, "না না, তা কেন? কোন কাজই খারাপ নয়।"

গোগোল কথাটা বই পড়ে আর বাবার মুখ থেকে শুনে শিখেছে, কোন কাজই খারাপ নয়। আর কে কী কাজ করে, তা দিয়ে কখনো ভাল-মন্দ বিচার করতে নেই। গোগোলের ভয় হচ্ছিল, পাছে জর্জ বলে দেয়, ও লোকটাকে ড্রাইভার বলে আন্দাজ করেছিল। ও আবার জিজ্ঞেস করল, ''চান্দা সিং আপনাকে আসতে বলল, আর ফ্ল্যাটের ঠিকানা বলে দেয়নি?"

চান্দার মামা হেসে বলল, ''লোও, খোকা তো আমাকে

ঝন্টু-মন্টু এবং "তাইতো"

চিত্র-পরাগ রায়
বয়স—১১ বছর

এই শহরটা ঝন্টু-মন্টুর মত তোমারও। এই শহরটার ভাল মানে তোমারও ভাল,—ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (সি.এম.ডি.এ)

'মুতানুটি গেজেট'(বাংলা),'ক্যালকাটা পাস্ট, প্রেজেন্ট, ফিউচার'(ইংরাজী) প্রতিটির দাম এক টাকা। নগদে বা মনিঅর্ডারে সি.এম.ডি.এর অফিস ৩এ, অকল্যান্ড প্লেস, কলকাতা-১৭ তে পাওয়া যাচ্ছে।

পুলিসের মাফিক জেরা শুরু করে দিয়েছে। কী করব বলো? আমরা মামা ভাগিনা, দুজনেই বহুত বোকা আছি। চান্দা আমাকে খালি এই বিল্ডিংটার নাম বাতলে দিয়েছিল, আমিও আর কিছু জিজ্ঞাস্ করিনি। কিন্তু চান্দাটা একদম বেওয়াকুফ্ আছে। আমাকে আসতে বলে, ও নিজেই হাওয়া হয়ে গেছে। আমিও বোকা বনে চলে যাই।" বলে হাসতে হাসতে, গোগোল আর জর্জের দিকে হাত তুলে বিদায় নিয়ে, লিফ্টের কাছে এগিয়ে গেল। যেতে যেতে হঠাৎ থেমে বলল, "তোমাদের সঙ্গে চান্দার দেখা হলে বাতিয়ে দিও, ওর মামা এসেছিল, হাঁ?" বলে আবার হাত তুলে, দেওয়ালের আড়ালে চলে গেল।

গোগোল আর জর্জ দুজনে দুজনের দিকে তাকাল। জর্জ হেসে কিছু বলতে যেতেই, গোগোল ঠোঁটে আঙুল রেখে কথা বলতে বারণ করল। ও মহেশানিদের বন্ধ দরজাটার দিকে একবার দেখে, জর্জের হাত ধরে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে লাগল। গোগোলকে বেশ চিন্তিত দেখাচ্ছে। জর্জ আর চুপ করে থাকতে পারল না। বলল, "এখন আর কী ভাবছিস? জেনেই তো গেলি, লোকটা কে। আর আমি তোকে ঠিকই বলেছিলাম, চান্দা সিং সব সুইচ্ অফ্ করে দিয়ে কোথাও বেরিয়ে গেছে।"

গোগোল কথাটা মোটেই মেনে নিতে পারল না। বলল, "ঘরের ভেতরে যে-শব্দগুলো শুনেছিলাম, সে সব তা হলে মিথ্যে বলতে চাস?"

জর্জ ওর বড় বড় দাঁতে হেসে বলল, "তা ছাড়া আর কী? ডাবুদার হারিয়ে যাওয়ার খবর শুনে তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কী শুনতে কী শুনেছিস, তার ঠিক নেই। তা ছাড়া, ডাবুদার হারিয়ে যাওয়ার সঙ্গে মহেশানিদের ফ্ল্যাটের কী ব্যাপার থাকতে পারে?"

কিছুই থাকতে পারে না, গোগোলও সেটা মানে। কারণ ডাবুদা খেয়ে ইস্কুলে যাবার পথেই কোথাও কিছু একটা গোলমাল ঘটে গিয়েছে। কী গোলমাল ঘটতে পারে গোগোল সেটা কিছুই অনুমান করতে পারে না। কিন্তু তা বলে মহেশানিদের ফ্ল্যাটের ভেতর থেকে কোন শব্দই ও শুনতে পায়নি, সেটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। প্রথমে ফিসফিস্ সেই "এই চুপ!" তারপরেই ধুপ করে কিছু পরে যাওয়ার শব্দ। এটা হল প্রথমবার। দ্বিতীয়বার সাপের হিসিয়ে ওঠার মতো শব্দ "হিসস্স্।" গোগোল হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। ওরা কথা বলতে-বলতে দোতলায় নেমে এসেছে। গোগোল দাঁড়িয়ে পড়তে, জর্জও দাঁড়িয়ে পড়ল। গোগোল বলল, "আচ্ছা, তোকে বলেছিলাম, আমি যখন প্রথম মহেশানিদের বন্ধ দরজার লকের ফুটোয় উঁকি দিয়েছিলাম, কিছুই দেখতে পাইনি। তার মানে পর্দাটা ঝুলছিল। আর এখন, তুই যখন কলিং বেল টিপছিলি আমি তখন ফুটোয় চোখ দিয়ে দেখলাম, ভেতরে খুব ডিম্ আলো জ্বলছিল। তার মানে কী? পর্দাটা তোলা ছিল। তা না হলে আমি ভেতরের আলো দেখব কেমন করে? কিন্তু হঠাৎ কী হল জানিস? ঝপ করে আলোটা ঢাকা পড়ে গেল। মনে হল, কেউ যেন ভেতরে পর্দাটা তুলেছিল, তারপরে হঠাৎ ফেলে দিল। আমি সেই কথাটাই তখন তোকে বলতে যাচ্ছিলাম, তার মধ্যেই লিফ্টে করে ওই লোকটা এসে পড়ল।"

জর্জ ঠোঁটে ঠোঁট চেপে কয়েক সেকেন্ড ভেবে বলল "তার মানে, তুই বলতে চাইছিস, চান্দা সিং ভেতরেই রয়েছে?"

গোগোল বলল, "তা আমি জানব কী করে? আমি তো চান্দা সিংকে দেখতে পাইনি।"

জর্জ বলল, "তোর কথা থেকে তো তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু এটা কেমন করে হয়? চান্দা সিংয়ের মামা এসে এত দরজা ধাক্কা দিল, চেঁচিয়ে ডাকল, তবু কোন জবাব পাওয়া গেল না। চান্দা সিং ভেতরে থেকেও জবাব দেবে না, তা কী করে হতে পারে?"

গোগোলকে জর্জের কথা মেনে নিতেই হল, আর মাথা নেড়ে বলল, "না, তা কী করে হবে?"

জর্জ ওর বড়-বড় দাঁতে হেসে বলল, "তোর কথা যদি সত্যি হয়, তা হলে বলতে হয়, মহেশানিদের ফ্ল্যাটের মধ্যে চোর ঢুকে বসে আছে!"

জর্জের কথা বলার ভঙ্গি থেকেই গোগোল বুঝতে পারল, জর্জ ওকে ঠাট্টা করছে। গোগোলের রাগ হয়ে গেল. বলল, "তা হলে কি তুই বলতে চাস, আমার সব শোনা, সব দেখা, সব কথা একদম ফল্স্?"

গোগোলের রাগী মুখের দিকে তাকিয়ে, জর্জের কালো চোখ দুটো চিকচিক করে উঠল, আর ওর সেই টিপিক্যাল পেছনে লাগার হাসি হেসে বলল, "আমি কি তাই বলেছি নাকি?"

গোগোল নাছোড়বান্দার মতো জিজ্ঞেস করল, "তা হলে? তুই ওরকম হাসছিস কেন? ভাবটা দেখাচ্ছিস, আমি যেন সব ফল্স দিচ্ছি।"

জর্জ ওর হাসিটা চাপবার চেষ্টা করল, বলল, "আসলে, জানিস গোগোল, সবকিছুর রুট হচ্ছে ডাবুদা।"

গোগোল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "তার মানে?"

জর্জ বলল, "আমার মা এক-এক সময় কী বলেন জানিস? বলেন, একটা কোন বিপদ আপদ ঘটলে, লোকেরা নাকি অদ্ভুত সব কিছু দেখতে আর শুনতে পায়। আন্ন্যাচারেল ফিলিংস যাকে বলে।"

তার মানে গোগোলের সব শোনা আর দেখা একটা ভুতুড়ে ব্যাপার? জর্জের কথা থেকে তাই মনে হচ্ছে, আর এসবের মূলে ডাবুদার হারিয়ে যাওয়াটাই কারণ। ডাবুদার ঘটনায় গোগোল ভয়ে সব ভুতুড়ে শব্দ শুনেছে আর ছবি দেখেছে! এর একটাই অর্থ হয়, জর্জ গোগোলকে বিশ্বাস করেনি। রাগ ছাড়াও গোগোলের মনে বেশ অভিমান হল, আর ও কিছু বলতে যাবে, তখনই একতলা থেকে দোতলায় উঠে এল বঙ্কিমদা, যে গোগোলদের বাড়িতে কাজ করে। গোগোলকে দেখেই বঙ্কিমদা বেশ একটু ধমক দিয়েই বলে উঠল, "কোথায় ছিলে তুমি? আমি তোমাকে বাড়ির নীচে, রাস্তায় কোথাও খুঁজে পাচ্ছিলাম না!"

বঙ্কিমদা গোগোলকে ধমক দিতেই পারে। বঙ্কিমদা ওকে ভালবাসে। আর ও এক-এক সময় ভালমানুষ বঙ্কিমদার ঘাড়ে পিঠে চেপে খুব জ্বালাতন করে। জুডো আর ক্যারাটের কায়দা-কানুনগুলো অনেক সময় বঙ্কিমদার ওপর দিয়েই পরীক্ষা করে নেয়। মা'ও তখন বিরক্ত হয়ে বলেন, "বঙ্কিম, ওকে দু ঘা দাও।"

বঙ্কিমদা অবিশ্যি দু ঘা দেবার লোক কখনোই না। বরং বঙ্কিমদা গোগোলের জ্বালাতনের ঠেলায় হেসেই ওঠে। গোগোল জবাব দিল, "আমি তো বাইরে যাইনি, ভেতরেই রয়েছি।"

বঙ্কিমদা বলল, "মা বললেন, "তুমি নাকি নীচে বন্ধুদের সঙ্গে রয়েছ। আমি দেখতে পেলাম না। আর বাড়ির ভেতরেই বা তুমি কোথায় ছিলে?"

গোগোল এ কথার ঠিক জবাবটা দিতে পারল না। জর্জের দিকে তাকাল। বঙ্কিমদা আবার বলল, "কটা বেজেছে, খেয়াল আছে? মাস্টারমশাইয়ের পড়াতে আসার সময় হয়ে গেল। বাড়িতে চলো, মা তোমাকে কী রকম বকুনি লাগাবেন, দেখবে।"

জর্জ বলে উঠল "সত্যি, অনেক দেরি হয়ে গেছে। গোগোল, আমি বাড়ি যাচ্ছি, কাল দেখা হবে।" ও হাত তুলে দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

বঙ্কিমদা লিফ্টের দিকে পা বাড়িয়ে গোগোলকে ডাকল, "তাড়াতাড়ি এসো।"

গোগোল খেয়ালই করেনি, ঘরে ফেরার সময় হয়ে গিয়েছে। সাড়ে ছ'টায় সমীরদা—মানে, মাস্টারমশাই পড়াতে আসেন। মা নিশ্চয়ই বকুনি লাগাবেন। ও তাড়াতাড়ি লিফ্টের সামনে এগিয়ে গেল। **(ক্রমশ)** ৩৯

ছবি সমীর সরকার

প্ল্যানচেট

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

ধাতকাঠি বেস ক্যামপে সন্ধ্যার পরে আর কিছু করার ছিল না। চার-পাঁচ দিনের কাজ নিয়ে এসেছি। জিওলজিক্যাল সারভে অব ইণ্ডিয়ার পক্ষ থেকে সিংভূম কপার বেলটে তামার খনি অনুসন্ধানের কাজ কীরকম চলছে সে সম্পর্কে খোঁজখবর করে খবরের কাগজে গোটা কয়েক প্রবন্ধ লিখতে হবে। জায়গাটা টাটা-নগর রেল স্টেশন থেকে মাইল পাঁচেক দূরে। পাহাড় আর শাল-মহুয়ার জঙ্গলে ঢাকা। আশেপাশে লোকালয়ের চিহ্ন নেই। কয়েক একর জায়গা নিয়ে মিলিটারি ব্যারাকের মত কতগুলি কোয়ার্টার্স। মাটির দেওয়াল, খড়ের ছাউনি। দুজন জিওলজিস্ট ফ্যামিলি নিয়ে থাকেন। এছাড়া থাকেন নানা শ্রেণীর আরও কয়েকজন কর্মচারী। কলকাতা থেকে মোবাইল ফিলড ল্যাবরেটরির লোক-জনেরা এলে তাঁদেরও থাকার ব্যবস্থা আছে।

সকালবেলা উঠে সিনিয়র জিওলজিস্ট তুষার রায়ের সঙ্গে জীপে করে বেরিয়ে যেতাম। কোনদিন খারসোয়ান হয়ে সেরাই-কেলা। কোনদিন বা রাখা-রোম হয়ে সুরদা, মুশাবনি, পাথর-গোড়া। সঙ্গে থাকতেন ড্রিলিং ইঞ্জিনিয়র সুকুমার সামন্ত। আমাকে ওঁরা দেখাতেন, মাঠের মধ্যে কিংবা জঙ্গলের ভিতর অস্থায়ী তাঁবু খাটিয়ে ড্রিলিং ইউনিট কীভাবে কাজ করছে। মাটিতে বোর হোল করে রিগ মেশিন দিয়ে মাটির ভেতরকার তামার নমুনা কেটে কেটে ওপরে তোলা হচ্ছে।

তুষারবাবু আর সুকুমারবাবু দুজনেই খুব জমাটি লোক। বয়সেও তরুণ। আমাকে নানান মজার মজার কথা বলে মাতিয়ে রাখতেন। সুকুমারবাবু বলতেন, "কী করব মশায়, আপনাদের মত অমন কলম নেই। থাকলে কত রোমাঞ্চকর কাহিনী লিখতে পারতাম। এতদিনে দশ-বারোখানা বই হয়ে যেত।"

আমি বললাম, "আচ্ছা সুকুমারবাবু, আপনার তো এত অভিজ্ঞতা, বনে-জঙ্গলে ঘোরেন, কোনদিন ভূত দেখেছেন?"

সুকুমারবাবু এ প্রশ্নের জন্য ঠিক তৈরি ছিলেন না। বললেন, ভূত? না, মশায়, ভূত সম্পর্কে কোনদিন কিছু ভাবিনি। আমার নিজের কোন অভিজ্ঞতা নেই। তবে তুষারবাবু হয়ত এ বিষয়ে আপনাকে কিছু আলোকপাত করতে পারবেন। কারণ তুষারবাবু একটু আধটু প্রেতচর্চা করে থাকেন।"

এসব কথা হচ্ছিল আমার ধাতকাঠি আসার দ্বিতীয় দিন। সেদিন আমরা জীপে করে ঘাটশিলার দিকে চলেছি। মৌভাণ্ডার কপার প্ল্যানট দেখে যদুগোড়া ইউরেনিয়াম প্ল্যানটের ম্যানে-জারের সঙ্গে বিকেলে চা খাব এই প্রোগ্রাম। এদিন আমাদের আর একজন নতুন সঙ্গী মোবাইল ল্যাবরেটরির কেমিস্ট ডঃ জগদীশ শিকদার।

সুকুমারবাবুর কথা শুনে আমি রোমাঞ্চের গন্ধ পেয়ে লাফিয়ে উঠলাম। তুষার রায় আমার বাঁ পাশে বসে। আমি বললাম, "কী তুষারবাবু, আপনি প্রেতচর্চা করেন নাকি?"

তুষারবাবু বললেন, "সুকুমারের কথা ছেড়ে দিন।"

সুকুমারবাবু বললেন, "কেন ছেড়ে দেব কেন? চ্যাটার্জী সাহেবকে তোমার সেসব অভিজ্ঞতার কথা বল না তুষার। উনি গল্পের ভাল প্লট পাবেন।"

আমি বললাম, "হ্যাঁ, বলুন না!"

তুষারবাবু বললেন, "না তেমন কিছু বলার মত নয়। জিও-লজিস্টের কাজ জানেন তো, বছরের অধিকাংশ সময় জঙ্গলে জঙ্গলে কাটে। সন্ধ্যার পর কিছু করার থাকে না। এক সময় সময় কাটাবার জন্য প্ল্যানচেট করতাম।"

কেমিস্ট ডঃ শিকদার পিছনের সিটে বসে ছিলেন। বলে উঠলেন, "প্ল্যানচেট? আপনি বৈজ্ঞানিক হয়ে এইসব আজগুবি ব্যাপারে বিশ্বাস করেন?"

তুষারবাবু বললেন, "হ্যাঁ, করি। কারণ আমি নিজে প্ল্যানচেটে অনেক আত্মাকে এনেছি। ছোটবেলা থেকে প্ল্যানচেট করা দেখে আসছি। আমার ঠাকুমা নিয়মিত প্ল্যানচেট করতেন। ওঁর কাছেই প্রথম প্ল্যানচেট করা শিখি। আর আমি কেন, প্ল্যানচেট সম্পর্কে অনেক বড় বড় লোক অনেক কথা লিখে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একসময় নিজে নিয়মিত প্ল্যানচেট করেছেন।"

আমি সুযোগ পেয়ে বলে উঠলাম, "দেখুন, ধাতকাঠিতে আমারও সন্ধ্যার পর কিছু করার থাকছে না। আপনাদের

ইলেকট্রিসিটিরও ভোলটেজ এত কম যে,পড়াশোনাও করতে পারি না। আজ রাত থেকেই প্ল্যানচেটের আসর বসান না।"

সুকুমার সামন্ত বললেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি আর আপত্তি কোরো না তুষার। চ্যাটার্জী সাহেব এসেছেন, ওঁকে দেখিয়ে দাও।"

তুষারবাবু বললেন, "আগেই বলেছি আমার ঠাকুমার কাছ থেকে প্ল্যানচেট করতে শিখি প্রথম। ঠাকুমা তখনকার দিনের বেথুন কলেজের গ্রাজুয়েট। ওঁর ছোট মেয়ে মানে আমার ছোট পিসি হঠাৎ মারা যাওয়ার পরে ঠাকুমা প্ল্যানচেটে মেয়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন। সেই ঠাকুমা মারা গেলেন তখন আমি ক্লাস এইট-এ পড়ি। আমি ও আমার সেজদা ঠাকুমাকে খুব ভালবাসতাম। মাঝে মাঝে ছাদে গিয়ে দুজনে প্ল্যানচেটে ঠাকুমাকে ডাকতাম। আমাদের সঙ্গে অনেক গল্প করতেন ঠাকুমা। অধিকাংশই সাংসারিক কথাবার্তা, বাড়ির সবাই কে কেমন আছে খোঁজ নিতেন। আমি ও সেজদা পরীক্ষা দিয়ে জিজ্ঞাসা করতাম, 'আমরা পাশ করতে পারব তো ঠাকুমা?' ঠাকুমা বলতেন, 'পাশ হবে। তবে বড্ড ফাঁকি দিচ্ছিস পড়াশোনায়।' সেই সময় আমার প্রাণের বন্ধু ছিল বিমান বলে আমাদের ক্লাসের একটি ছেলে। কিন্তু কী একটা ব্যাপার নিয়ে আমাদের দুজনের মধ্যে খুব মন কষাকষি হয়ে গেল। আমাদের কথা বন্ধ। মন খুব খারাপ এজন্য। রাতে ঠাকুমাকে এ কথাটা জিজ্ঞাসা করব ভাবলাম। কথাটা হল, ঠাকুমা, বিমান কি আমায় ভালবাসে? কিন্তু কিছুতেই কথাটা জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না। হঠাৎ দেখি আমার কলমে সর সর করে লেখা ফুটে উঠেছে। 'তারা (আমার ডাকনাম), তোকে ও সত্যি ভালবাসে।' আমার হাত থেকে পেনসিল পড়ে গেল। গা শির শির করে উঠল। সেজদা জিজ্ঞাসা করল, 'এই তারা, কী হল তোর? কী জিজ্ঞাসা করেছিলি ঠাকুমাকে?' আমি কোন জবাব দিতে পারলাম না।"

শেষ পর্যন্ত অনেক পীড়াপীড়িতে তুষারবাবু প্ল্যানচেটের আসর বসাতে রাজি হলেন।

অতএব সন্ধ্যার কিছু পরে আমার ঘরে এসে হাজির হলেন সবাই—তুষারবাবু, সামন্ত আর ডঃ শিকদার। ইলেকট্রিক আলো নিবিয়ে দেওয়া হল। শুধু একটি হ্যারিকেন জ্বালা রইল। আমার পড়ার টেবিলটা ঘরের মাঝখানে রেখে তার চারপাশে চারজন।

তুষারবাবু বললেন, "আমার পদ্ধতিটা একটু ভিন্ন রকমের। ঠাকুমা আমায় বলতেন, যাকে তাকে প্ল্যানচেটের মিডিয়ম করা চলবে না। কতগুলো লক্ষণ দেখে মিডিয়ম নির্বাচন করতে হয়। সে লক্ষণগুলো আমি এখানে বলতে চাই না। তবে চ্যাটার্জী সাহেবকে দেখে মনে হচ্ছে উনি একজন আদর্শ মিডিয়ম। আপনাকে অনুরোধ করছি আপনি পেনসিলটা আলতো করে কাগজের ওপর ধরে মনে-মনে কোন আত্মার কথা চিন্তা করুন।"

আমি বললাম, "না মশায়, ওসব আমি পারব না। আপনি নিজে মিডিয়ম হন। আমরা বরং দেখি।"

তুষারবাবু বললেন, "ভয় পাচ্ছেন?"

আমি বললাম, "একটু একটু।"

"তাহলে আপনাকে দিয়ে হবে না। মিডিয়ম ভয় পেলে আত্মারা আসতে চাইবেন না। তাহলে আমিই মিডিয়ম হচ্ছি। শুনুন, আপনারা কোন কথা বলবেন না। আর পরস্পর পরস্পরকে ছুঁয়ে থাকবেন।"

তাই হল। একটু একটু করে আলো নিস্তেজ হয়ে এল। সাদা দেওয়ালে আমাদের ছায়াগুলো পড়ল। পাছে বাইরের আলোর ছটা এসে ঢোকে এজন্য জানালাগুলোও বন্ধ। কোথাও জীবনের কোন স্পন্দন আছে বলে মনে হল না। শুধু বাইরে থেকে ঝিঁঝিঁ পোকার অশ্রান্ত আওয়াজ কানে এসে বিঁধতে লাগল।

তুষারবাবুর হাতে একটি কৌটোর ঢাকনি ত্রিভুজের মত করে কাটা। মাঝখানে ফুটো করে একটি পেনসিল বসানো। সেটা আলতো করে ধরা।

একটু পরে দেখলাম ঢাকনিটা নড়ে উঠল। তুষারবাবুর মুখ শক্ত হয়ে উঠেছে। চোখের দৃষ্টি পাথরের মত।

ওঁর পেনসিল নড়ে উঠল।

তুষারবাবু অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, "কে?"

খস-খস করে লেখা ফুটে উঠল, "আমি ঠাকুমা।"

"কেমন আছ?"

"ভাল। তুই এতদিন আমায় কী করে ভুলে আছিস তারা?"

"আর তোমাদের কষ্ট দিতে ভাল লাগে না ঠাকুমা।"

"কষ্ট কী বলছিস তারা? তুই ডাকবি বলে কতদিন ঘোরাঘুরি করেছি তা জানিস?"

"তুমি আমায় এখনও খুব ভালবাস ঠাকুমা, তাই না?"

"ও মা, বাসব না? তুই তো ছিলি আমার সবচেয়ে নেওটা। হ্যাঁরে, তোর সেজদা কী করছে?"

"দুর্গাপুরে আছে ঠাকুমা। সেজদার গত মাসে একটি মেয়ে হয়েছে।"

"আহা বেঁচে-বর্তে থাক সব। তোর বড় মন খারাপ, তাই না রে? ও নিয়ে মিছিমিছি মন খারাপ করিস না, ওটা হবে না, তোর ভাগ্যে নেই।"

আমি দেখলাম শেষের কথাগুলো তুষারবাবু কিছুতেই ভাল করে লিখতে পারছেন না। যেন কোন অদৃশ্য শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করছেন। লেখা যেই শেষ হল অমনি তাঁর হাত থেকে পেনসিলটা পড়ে গেল। তিনি মাথা নিচু করে বসে পড়লেন।

"কী হল? কী হল? ও তুষারবাবু?"

তুষারবাবু বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সকলের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, "আশ্চর্য, এবারও ঠাকুমা সব জেনে ফেলেছেন।"

"কী জেনে ফেলেছেন?" সামন্ত প্রশ্ন করল।

"আমার একটা অত্যন্ত ব্যক্তিগত সমস্যার কথা। গত পাঁচ-ছ মাস ধরে যার জন্য উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছি। লুকিয়ে লুকিয়ে একটা চাকরির পরীক্ষা দিয়েছিলাম। খুব আশা ছিল চাকরিটা পাব, কিন্তু..."

পরের দিন আবার দিনের বেলাটা কাটল জঙ্গলে-জঙ্গলে। ডঃ শিকদার এদিন আমাদের সঙ্গে ছিলেন না। ল্যাবরেটরি টেসটের জন্য ব্যস্ত ছিলেন।

সকালবেলা তাঁর সঙ্গে দেখা হল। আমি বললাম, "প্ল্যানচেট বিশ্বাস করেন না তো, দেখলেন কাল কী আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল।"

ডঃ শিকদার বললেন, "আপনিও যেমন, ওই সবে আপনি এখনও বিশ্বাস করেন?"

আমি একটু রেগে বললাম, "তাহলে কাল রাতে যা দেখলাম আপনি বলতে চান সব বুজরুকি?"

"না, বুজরুকি নাও হতে পারে। তবে হ্যালুসিনেশন। মানুষ যা শুনতে ইচ্ছা করে অবচেতন মনের কাছ থেকে সেই জবাবই পাচ্ছে। আর সেটাই লেখা হয়ে যাচ্ছে। মানুষের মৃত্যুর পর তার কোন অশরীরী অস্তিত্ব থাকতে পারে না।"

আমি ক্ষীণ কণ্ঠে বলার চেষ্টা করলাম, "অশরীরী অস্তিত্বের নানান ঘটনার কিন্তু আমি সাক্ষ্য পেয়েছি।"

ডঃ শিকদার বললেন, "আপনি পেতে পারেন। আপনি গাল-গল্প লেখেন, অলৌকিকে বিশ্বাস না করলে আপনাদের চলে না। আমি বৈজ্ঞানিক লোক, বিজ্ঞান ও যুক্তিতর্ক ছাড়া কিছু

মানতে চাই না। আচ্ছা আমায় উনি মিডিয়ম হতে তো বললেন না। দেখতাম আমার হাত দিয়ে ওসব লেখা আসত কি না।"

আমি বললাম, "বেশ তো, আপনি আজ মিডিয়ম হন না।"

ডঃ শিকদার বললেন, "আমাকে হতে দিলে তো। দেখলেন না, তুষারবাবু আমার কথা তুললেনই না।"

পরদিন রাতে আবার প্ল্যানচেটের আসর বসল।

আমি বললাম, "তুষারবাবু, ডঃ শিকদার আজ মিডিয়ম হতে চান। আপনার আপত্তি আছে?"

তুষারবাবু একবার ডঃ শিকদারের আপাদমস্তক দেখে নিলেন। তারপর বললেন, "মনে হচ্ছে মিডিয়মের পক্ষে উনি উপযুক্ত নন।"

ডঃ শিকদারের মুখের কোণে উপহাসের হাসি দেখা গেল। তিনি বললেন, "আমি তো আপনাকে আগেই বলেছিলাম। উনি আমায় মিডিয়ম করতে রাজি হবেন না।"

তুষারবাবু বললেন, "ডঃ শিকদার, আপনাকে মিডিয়ম হতে দিলে আপনারই ক্ষতি হবার সম্ভাবনা। মিডিয়মের নিরাপত্তার জন্য কতগুলি লক্ষণ আমাদের মিলিয়ে দেখতে হয়।"

"আরে রাখুন ওই সব লক্ষণ। আমায় করতে চান না তাই বলুন।"

"বেশ, আপনাকে করতে পারি, কিন্তু কোন কিছু হলে আমাকে দায়ী করবেন না।"

"কোন কিছু মানে?"

"এই ধরুন কোন বিপদ-টিপদ।"

ডঃ শিকদার তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলেন।

হ্যাঁ, ডঃ শিকদারকেই মিডিয়ম করা হল। তিনি প্ল্যানচেটের চাকতিসুদ্ধ পেনসিলটা হাতে করে বসে রইলেন। তুষারবাবু ওঁর চোখের দিকে বেশ কিছুক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে কী যেন বিড় বিড় করে বললেন। তারপর বললেন, "ডঃ শিকদার, আপনার খুশিমত কোন আত্মার কথা চিন্তা করুন। অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করুন।"

ডঃ শিকদার চোখ বুজলেন। আবার কিছুক্ষণ পরে চোখ খুললেন। বেশ দেখতে পেলাম তার মুখের ছবি পালটে যাচ্ছে। তিনি ক্রমশ ধ্যানগম্ভীর এক মাটির স্ট্যাচুতে পরিণত হলেন। তারপর তাঁর সর্বশরীর নড়ে উঠল। তিনি বলে উঠলেন, "কে কে?"

"আমি তোমার মা।" কাগজে লেখা ফুটে উঠতে লাগল। ডঃ শিকদারের পেনসিল চলছে খসখস করে।

"তুমি কোথা থেকে এলে?"

"কলকাতা থেকে।"

"কলকাতার খবর কী?"

"সব ভাল। বউমা খুব কান্নাকাটি করছে দেখে এলাম।"

"কেন? কেন?" অস্ফুট স্বরে প্রশ্ন করলেন ডঃ শিকদার।

পেনসিলটা কী যেন লিখতে গেল কিন্তু লিখতে পারল না। একটু নড়ে স্থির হয়ে গেল।

ডঃ শিকদার আবার ডাকলেন, "মা—মা।" আবার লেখা ফুটে উঠল, "আসতে খুব কষ্ট হয়েছে।"

"কষ্ট কেন?"

"হবে না? কম দূর পথ নাকি?"

"তুমি কী করে এলে?"

"যেভাবে সবাই আসে। তুই ডাকলি, না এসে থাকতে পারলাম না।"

"কিন্তু বউমা কাঁদছে কেন মা?"

কোন উত্তর পাওয়া গেল না। ডঃ শিকদার আবার জিজ্ঞাসা বললেন, "মা মা, বউমা কাঁদছে কেন?"

হঠাৎ একটা দমকা বাতাস এসে বাইরের জানালাটা খুলে দিয়ে গেল। দপ দপ করে নিবে গেল হ্যারিকেনটা। টেবিলটা প্রবল জোরে নড়ে উঠল। আমরা চমকে উঠলাম। শুনলাম অন্ধকারের মধ্যে ডঃ শিকদার চেঁচাচ্ছেন, "সব বোগাস, সব বোগাস। আমাকে সম্মোহিত করে আমার হাত দিয়ে মনোমত উত্তর লিখিয়ে নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছিল। কিন্তু এই প্ল্যানচেট যে কত বড় বোগাস তার বড় প্রমাণ আমার মা জীবিত। তিনি সুস্থ-সমর্থ। গত পরশু আমি কলকাতা ছেড়েছি। পরশু পর্যন্ত জানি, তিনি সুস্থ স্বাভাবিক ছিলেন।"

তুষারবাবু বললেন, "তাহলে আপনি জীবিত মানুষকে কেন স্মরণ করলেন ডঃ শিকদার?"

ডঃ শিকদার বললেন, "আপনাদের এই প্ল্যানচেট যে কত বোগাস তা প্রমাণ করার জন্য।"

"কিন্তু আপনি জানেন না কী সর্বনাশ আপনি করেছেন! আপনাকে এই জন্যেই আমি মিডিয়ম করতে চাইনি। ইভল্ স্পিরিট আপনার ক্ষতি করতে পারে। পারে কি, করেছেও হয়তো ডঃ শিকদার।" তুষারবাবু গম্ভীর মুখে বললেন।

ডঃ শিকদার এবার যেন সম্বিত ফিরে পেলেন। বললেন, "কী বলছেন আপনি?"

তুষারবাবু বললেন, "যা বলছি, ঠিকই বলছি ডঃ শিকদার।"

ঘণ্টা দুয়েক পরে ঘটল ঘটনাটা। এবং যা ঘটল তা আমি কোনদিনই ভুলব না, ভুলতে পারব না। আজও সে রাতের সে পরিস্থিতির কথা মনে করলে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

রাত তখন দশটা। আমি খেয়েদেয়ে সবে শুতে যাব। দুঘণ্টার আগেকার ঘটনাটা তখনও চোখের সামনে ভাসছে। ডঃ শিকদার প্ল্যানচেটের পর থেকে আরও অবিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন। আমাকে অনেকবার বলেছেন, "কেমন, দেখলেন তো ব্যাপারটা। জীবন্ত মানুষ চলে এল আপনাদের এই প্ল্যানচেটে।"

কিন্তু তখনও ডঃ শিকদার জানতেন না নিয়তি তাঁর জন্য কী প্রস্তুত করে রেখেছে।

রাত দশটা নাগাদ একটা আর্তনাদ শুনে চমকে উঠলাম।

ডঃ শিকদার চিৎকার করছেন, "না, না, এ হতে পারে না।"

চিৎকার শুনে বেস ক্যাম্পের সব লোক ছুটে এসেছে তাঁর ঘরের সামনে। ভিড় জমে গেছে। ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢুকে দেখি ডঃ শিকদার চিৎকার করছেন, এ হতে পারে না, এ হতে পারে না।"

তুষারবাবু ঘরের এক পাশে দাঁড়িয়ে ডঃ শিকদারকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। তুষারবাবুকে বাইরে ডেকে নিয়ে এলাম কী হয়েছে জিজ্ঞাসা করতে।

তুষারবাবু বললেন, "আমাদের এখানে ফোন নেই। কলকাতার সঙ্গে কোন জরুরি কথাবার্তা থাকলে দু মাইল দূরে অ্যাটমিক মিনারলস ডিভিশনের অফিসে ফোন আসে। ওখান থেকে মেসেনজার দিয়ে খবর পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিছুক্ষণ আগে ওখানে ডঃ শিকদারের বাড়ি থেকে এক জরুরি ট্রাঙ্ক কল এসেছে। ট্রাঙ্ক কল করেছিলেন মিসেস শিকদার। ঘণ্টা দুয়েক আগে ডঃ শিকদারের মা তাঁর বাড়ির সামনে লরি চাপা পড়ে মারা গিয়েছেন। ওই সময় রাস্তায় যাবার কোন প্রয়োজন ছিল না তাঁর। হঠাৎ কী খেয়াল হল, বললেন, "আমি একটু অরুণদের বাড়ি থেকে আসছি। অরুণ হল ওঁদের এক প্রতিবেশী। রাস্তায় যেই নেমেছেন অমনি লরি এসে...।"

তুষারবাবু বললেন, "টাইমটা ঠিক দুঘণ্টা আগে, যখন ডঃ শিকদার প্ল্যানচেটে বসেছিলেন ঠিক তখনই। আমি তখনই মনে মনে আশঙ্কা করেছিলাম এমন একটা কিছু ঘটবে...আমি তখনই আশঙ্কা করেছিলাম।" তুষারবাবু বিড়বিড় করে বললেন।

ছবি মদন সরকার

দোনলা অমূল্য পাল

পাখি যখন ডিমের ভেতর,
জেনো তখন নানান ঝক্কি।
খোলস ছেড়ে কে বেরোবেন—
বায়স কিংবা কোকিল পক্ষী ?
বাসায় বসে মনের সুখে
তা দিতেছেন কাকি-মা।
হয়তো শেষে দেখবে, তিনি
নিতান্তই যে ফাঁকি-মা॥

২

একুশ না দশ হয়
নিই যদি তিন-সাত ?
ভেবে ভেবে হন কাবু
বড়বাবু দিন সাত।
শেষে দূর-ছাই বলে
নিয়ে 'উট্ প্যান্সিল'
পিটিশান্ যত ছিল
করে দেন 'ক্যান্সিল'॥

ছবি সুনীল শীল

অ্যাই ন্যাড়া

রঞ্জন ভাদুড়ী

অ্যাই ন্যাড়া শোন, তোর কুকুরটা বড় নেড়ী,
পিছনের পায়ে আছে বোধ করি বেরিবেরি—
লেংচে লেংচে হাঁটে, কেবলি নোংরা শোঁকে,
সুতরাং লুসি নাম মানায় না মোটে ওকে!
তোদের বাড়িতে আছে যতগুলো গাইগরু—
সবগুলো শিঙভাঙা, ঠ্যাংগুলো সরু-সরু।
তোদের খাঁচায় আছে ধেড়ে এক কাকাতুয়া—
কিছুই শেখেনি বুলি, বলে শুধু 'কেয়া হুয়া!
তোদের পুকুরে নাকি বড়-বড় মাছ আছে—
বলেছিলি—গিয়ে দেখি শুধুই ব্যাঙাচি নাচে!
যেটাকে পক্ষিরাজ নামেতে ডাকিস তোরা,
গাঁয়ের সবাই জানে সেটা এক বেতো ঘোড়া।
তোদের বাড়িটা যেন কী-রকম এঁদো-এঁদো—
চারদিকে ঝোপঝাড়, কেবলি শেয়াল, কেঁদো
বাঘ ডাকে দিনে-রাতে—ঘরগুলো নিচু-নিচু—
ইঁদুরেরা ঘোরেফেরে মানুষের পিছু-পিছু!
তোর কথা বলব কী—পেটরোগা, মাথামোটা,
তোতলামি বেড়ে গেছে চিবিয়ে পানের বোঁটা।
অবিশ্যি সব-কিছু ঠিক হয়ে যেতে পারে—
এত-সব গলতিও ফুল মার্কস পেতে পারে
ঘোড়া হবে টগবগে, গরু হবে মুলতানী
এঁদো বাড়ি হয়ে যাবে বাদশাহী সুলতানী
আর যা-যা খুঁত আছে কোনোটাই থাকবে
আমাকে খাওয়াস যদি, দিস কিছু ধারদেনা।

ছবি সুনীল ঘোষ

বিশ্ব-বিচিত্রা

দিদিমণি

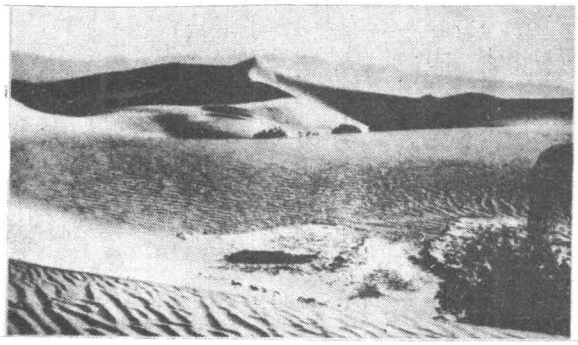

মরুভূমি

পৃথিবীতে এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে বছরে একবারও বৃষ্টি হয় না। সাধারণত উষ্ণ মণ্ডলে যেখানে বছরে দশ ইঞ্চিরও কম বৃষ্টি হয় সেখানেই উষ্ণ মরুভূমির সৃষ্টি হয়েছে। নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলেও মরুভূমি দেখা যায়। যেমন, চীন ও সাইবেরিয়ার মধ্যবর্তী গোবি মরুভূমি। মরুভূমি বলতে যদি এমন সব জায়গা বোঝায় যেখানে কোনো গাছপালা জন্মায় না —তাহলে এশিয়ার সবচেয়ে উত্তরে সাইবেরিয়ার অংশ, কানাডার উত্তরাংশ এবং গ্রীনল্যান্ড ও দক্ষিণ মেরুদেশ বা অ্যান্টার্কটিককেও মরুভূমি বলা যেতে পারে। এই সব দেশে ভীষণ ঠাণ্ডা এবং সব কিছু বরফে ঢাকা থাকে, সেইজন্যে কোন গাছপালা জন্মায় না।

পৃথিবীর বৃহত্তম উষ্ণ মরুভূমি হল উত্তর আফ্রিকার সাহারা। উত্তর থেকে দক্ষিণে এর বিস্তার গড়ে ৬০০ মাইল, এবং পূর্ব-পশ্চিমে লোহিত সাগর থেকে প্রায় আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত এর বিস্তার প্রায় ৩,০০০ মাইল। অর্থাৎ সম্পূর্ণ সাহারা মরুভূমি আয়তনে ইউরোপের চার ভাগের তিন ভাগের সমান। গোবি মরুভূমিও বিশাল। আরব দেশ ও ইরাকের অনেক অংশকেও মরুভূমি বলা যায়। দক্ষিণ-আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে কালাহারি মরুভূমি, পশ্চিম অস্ট্রেলিয়াতেও বিশাল মরুভূমি আছে। উত্তর আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে ক্যালিফোর্নিয়া ও অ্যারিজোনা রাজ্যেও মরুভূমি আছে। দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলের পেরুতেও অ্যাটাকামা মরুভূমি আছে, আর ভারতে আছে থর মরুভূমি।

উষ্ণ মণ্ডলের মরুভূমিগুলির বৈশিষ্ট্য হল, এগুলির বেশির ভাগই মহাদেশের পশ্চিম দিকে ২০° থেকে ৩০° অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত। এই মরুভূমি সৃষ্টির কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে, এখানে সাধারণত স্থলভাগ থেকে বায়ু জলভাগের দিকে যায়—সেইজন্যে বায়ুতে জলীয় বাষ্প থাকে না, আর বৃষ্টিপাতও হয় না। এছাড়াও এই সব মরুভূমিগুলির পাশ দিয়ে শীতল সমুদ্র-স্রোত প্রবাহিত হয়, কাজেই বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আরও কমে যায়। কিন্তু অনেক মরুভূমি গাছপালার সম্পদ থেকে বঞ্চিত হলেও প্রকৃতি অনেক ক্ষেত্রে দামী দামী খনিজ সম্পদ দিয়ে এই ক্ষতি পূরণ করে দিয়েছে। ক্যালিফোর্নিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার মরু অঞ্চলে সোনা পাওয়া যায়। আরব ও ইরাকের মরু অঞ্চলে ও ক্যালিফোর্নিয়ার মরুভূমিতে পেট্রল পাওয়া যায়। চিলির অ্যাটাকামা মরুভূমিতে পাওয়া যায় তামা ও প্রচুর নাইট্রেট বা সোরা। চিলির মতো এত শুকনো মরুভূমি বোধ হয় আর কোথাও নেই—এমন জায়গাও আছে যেখানে কুড়ি বছরেও এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়েনি।

মরুভূমিতে গাছপালা বেশি না থাকায় বায়ু অবাধে ক্ষয়কার্য চালায়। দিনে সূর্যের তাপে মরুভূমির শিলা প্রসারিত হয়, আবার রাতে ঠাণ্ডা হয়ে সংকুচিত হয়। ওইভাবে প্রসারণ ও সংকোচনের ফলে শিলা ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে বালির সৃষ্টি করে। বায়ু এই বালি উড়িয়ে নিয়ে যায় এবং বালুময় বায়ু যেখান দিয়ে বয়ে যায় সেখানেই ক্ষয়কার্য চলতে থাকে। মাটির স্তর থেকে কয়েক ফুট উঁচুতে এই ক্ষয়পর্ব সবচেয়ে বেশি। এ ছাড়াও উড়ন্ত বালি কোথাও কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হয়ে অর্ধচন্দ্র আকৃতির বালিয়াড়ি সৃষ্টি করে। এই বালিয়াড়িগুলিকে বলা হয় বারখান।

ডোডো তাতাই

লেখা। তারাপদ রায়
রেখা। কৃত্তিবাস রায়

তাতাইবাবুর কুকুর চিলির চারটে অসাধারণ বাচ্চা হয়েছে, দুটো ছেলে আর দুটো মেয়ে। তারা শুধু দেখতেই যে সুন্দর তা নয়—তাদের যেমন সাহস, তেমন বুদ্ধি আর প্রভুভক্তি। এখন তাদের মাত্র পাঁচ সপ্তাহ বয়েস হয়েছে, এরই মধ্যে তারা তাতাইবাবুকে চিনে ফেলেছে, তাতাইবাবুকে সামনে দেখলেই তারা অভিভূত হয়ে পড়ে। কেউ চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে, কেউ পা চাটতে থাকে, একজন তো এমন লেজ নাড়ায় যে দেখে মনে হয়, আরেকটু জোরে নাড়ালে লেজটা খুলে পড়ে যাবে। যদিও এরা বেশিদিন তাতাইবাবুদের বাড়িতে থাকবে না, এদের বিলিয়ে দেওয়া হবে, তবু এই অল্প সময়ের জন্যেই তাতাইবাবু তার কুকুর-ছানাদের ভাল ভাল নাম রেখেছেন। ফলের নামে নাম, ছেলে দুটোর নামকরণ হয়েছে আনারস আর জামরুল, আর মেয়ে দুটো হল বেদানা আর ডালিম। আসলে মেয়ে বাচ্চা দুটো একেবারে একরকম দেখতে, তাই তাদের একইরকম নাম। আর এদিকে আনারস যার নাম রাখা হয়েছে তার গায়ে সাদা কালো ডোরা-ডোরা, দেখলেই বোঝা যায় এরই নাম আনারস, আর জামরুল সবচেয়ে সুন্দর, তার কান সবচেয়ে ঝোলা, সে একেবারে গোলগাল, সাদা ধবধবে।

কুকুরছানাগুলো যত বড় হচ্ছে তাদের বিলিয়ে দেওয়ার দিন ততই ঘনিয়ে আসছে, আর তাতাইবাবুর মন খারাপ হচ্ছে। ডোডোবাবু এখন এখানে নেই, দশ-বারোদিনের মধ্যে তিনি আসবেন, তিনি এসে এই বাচ্চাগুলোকে একবার না দেখা পর্যন্ত এগুলোকে রেখে দেওয়ার ইচ্ছে তাতাইবাবুর। কিন্তু এর মধ্যেই এরা সাঙ্ঘাতিক সব কাণ্ড শুরু করেছে। এই তো কালকেই আনারস আর ডালিম দুজনে মিলে একটা পাপোষের দফা রফা করে দিয়েছে, আজকের সকাল-বেলার কাগজটা জামরুল ফালাফালা করে ছিঁড়েছে আর বেদানা সদাসর্বদা দরজার পর্দা বেয়ে উপরে উঠে যাওয়ার চেষ্টা করছে, যদিও একবারও পারছে না।

তাতাইবাবু একটা লিস্ট তৈরি করেছেন কাকে কোন্ বাচ্চাটা উপহার দেওয়া হবে, ভাল ভাল বাড়ি ঠিক করা হয়েছে এদের জন্যে, কিন্তু দুঃখের কথা অনেকেই এত সুন্দর উপহার গ্রহণ করতে পিছিয়ে যাচ্ছেন। তা যাক, ততদিন বাচ্চাগুলো তাতাইবাবুদের বারান্দায় হুটোপাটি করুক আর ডোডোবাবু ফিরে আসুন।

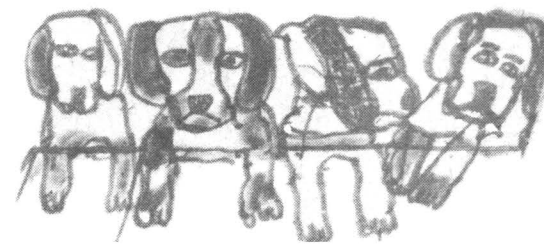

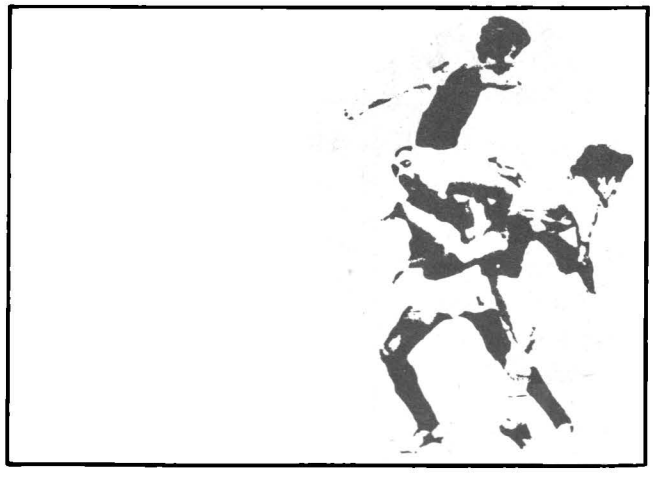

শীল্ড জিতল মোহনবাগান

পুষ্পেন সরকার

মোহনবাগান আই এফ এ শীল্ড জিতেছে। ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে এই জয়। লীগের হারের পাল্টা জবাব। ২৮শে সেপ্টেম্বর শীল্ড ফাইনাল শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মোহনবাগানের খেলোয়াড়, সদস্য এবং সমর্থকরা আনন্দ করেছেন প্রাণভরে। রাস্তাঘাটে, বাড়িতে, পাড়ায় আনন্দের স্রোত বয়ে গেছে। মশাল, বাজি, বাজনা। মিষ্টির ছড়াছড়ি। এ আনন্দ শুধু কলকাতাতেই হয়নি। ছড়িয়ে পড়ে মফস্বলেও। এমন কী অন্য রাজ্যেও।

মোহনবাগান এবারকার শীল্ড জিতল। অবশ্য শীল্ড জয়ে ইস্টবেঙ্গল এখনও এগিয়ে আছে। মোট পনেরবার পেয়েছে ইস্টবেঙ্গল। শীল্ড ফাইনালে দুই দলের সাক্ষাৎকার ঘটেছে ১৬ বার। এর মধ্যে মোহনবাগান জিতেছে তিন বার। ইস্টবেঙ্গলের জয়ের সংখ্যা অনেক বেশি।

মোহনবাগান এ বছর যোগ্য দল হিসাবে আই এফ এ শীল্ড জিতেছে। ফেডারেশন কাপ জয়ী ইণ্ডিয়ান টেলিফোন ইণ্ডাস্ট্রিজকে কোয়ার্টার ফাইনালে শোচনীয়ভাবে ৫—১ গোলে হারিয়ে দেয় মোহনবাগান। ফেডারেশন কাপ ফাইনালে কিন্তু মোহনবাগানই ঐ দলের কাছে হেরেছিল ১—০ গোলে। মোহনবাগান সেই পরাজয়ের জবাব দিল ভালভাবেই।

সেমিফাইনালে এরিয়ানের বিরুদ্ধে প্রায় একতরফা খেলে ৪—০ গোলে জয়লাভ করে মোহনবাগান ফাইনালে ওঠে। তারপর পেলে সহ কসমস ক্লাবের বিরুদ্ধে প্রদর্শনী খেলায় মিলিত শক্তির এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত রাখে মোহনবাগান। কসমসের নামীদামী খেলোয়াড়রা পর্যন্ত মোহনবাগানের প্রশংসা করতে বাধ্য হন। এমন কী, ফুটবল-সম্রাট পেলেও স্বীকার করেন, মোহনবাগান সত্যিই ভাল খেলেছে। পরপর এই তিনটি খেলা দেখেই বোঝা গিয়েছিল, ১৯৭৭ সালের আই এফ এ শীল্ড মোহনবাগানের ঘরেই উঠবে।

তারপর এল ২৮ সেপ্টেম্বরের শীল্ড ফাইনালের স্মরণীয় দিন। সকল বিভাগে যোগ্যতা দেখিয়ে জয়ী হল মোহনবাগান। এক গোলে জয়পরাজয় নিষ্পত্তি হল। আরও বেশি গোলে জিতলেও আশ্চর্য হবার কিছু থাকত না।

সেদিনের শ্যাম থাপার গোলের কথা অনেকদিন মনে থাকবে সকলের। শ্যামের বয়স হয়েছে। কিন্তু গোলের সামনে বল পেলে আজও যে তিনি ভয়ঙ্কর, সেটা আবার দেখালেন। হাবিবের কাছ থেকে বল পেলেন। বাঁ পায়ে ধরলেন। ডান দিকে শরীরটা একটু বেঁকে গিয়েছিল। ইস্টবেঙ্গল গোলরক্ষক নিশ্চিত ধরে নিয়েছিলেন এ অবস্থায় শ্যামকে গোলরক্ষকের বাঁ দিকে বল মারতেই হবে। কিন্তু চোখের নিমেষে শরীরের ভারসাম্য বদলে গোলরক্ষকের ডান দিকে বল মারলেন শ্যাম। গোলের সামনে এমনি এক মুহূর্তে নিজের বুদ্ধি বিবেচনা খাটিয়ে এ জাতীয় গোল কমই চোখে পড়ে। বড় খেলোয়াড় ছাড়া করতে পারে না। শ্যাম

বিদেশ বল নিয়ে এগোতে গিয়ে বাধা পেয়েছেন

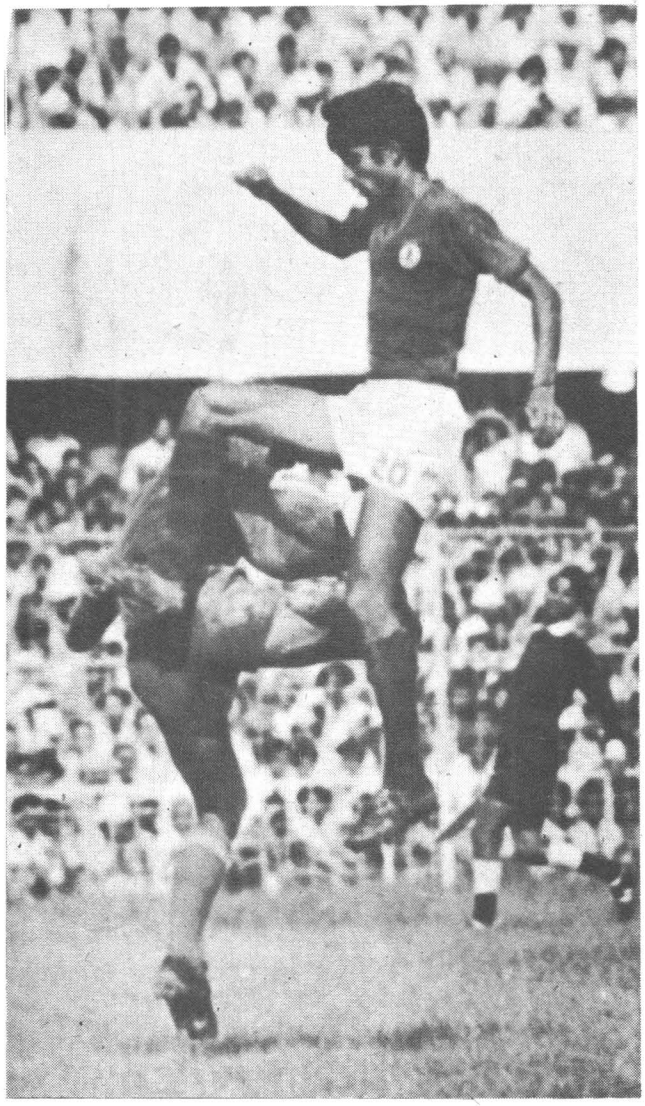

মানস লাফাবার আগেই বল চলে গেছে ভাস্করের হাতে

অবশ্য এ-রকম গোল আগেও করেছেন, এটা তাঁর কাছে নতুন কিছু নয়। তবে ১৯৭৭ সালের শীল্ড জয়ের গোলটি শ্যাম থাপার জীবনে একটা বড় কীর্তি হিসাবে ইতিহাসে লেখা থাকবে।

অধিনায়ক সুব্রত ভট্টাচার্যও সেদিন অসাধারণ খেলা খেলেছিলেন। সাধারণত সুব্রত একটু চড়া মেজাজে খেলেন। কিন্তু ফাইনালে সুব্রতকে দেখা গেল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতিতে। ধীর, স্থির। বিপক্ষের আক্রমণ একের-পর-এক ফিরিয়ে দিচ্ছেন। যেখানে বিপদ সেখানেই সুব্রত। দলের গোলের সামনে সেই পাহাড় টপকে ঢুকতে গিয়ে বার বার বাধা পেয়ে ফিরে আসতে লাগলেন ইস্টবেঙ্গলের খেলোয়াড়রা। মাঠের চারিদিক থেকে অভিনন্দন। সকলের মুখে—সাবাস অধিনায়ক।

সুধীর কর্মকার দেখালেন, আজও তিনি রাইটব্যাক হিসাবে কত বড়। গৌতম সরকার আর প্রসূন ব্যানার্জির মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতা ছিল, কে কার থেকে বড় সেটা প্রমাণ করার। সুরজিৎ সেনগুপ্ত ও উলগানাথনের মত দুজন কুশলী ফরোয়ার্ডকে একেবারে পঙ্গু করে রেখেছিলেন গৌতম ও প্রসূন। ফরোয়ার্ডে বিদেশ বসু ছিলেন সব থেকে বিপজ্জনক। তাঁকে আটকানো সমস্যা হয়ে উঠেছিল ইস্টবেঙ্গলের রক্ষণভাগের কাছে। পায়ের ছোট-ছোট সুন্দর ইনসাইড ও আউটসাইড ডজ। ক্ষিপ্র গতি। ইস্টবেঙ্গলের রক্ষণভাগকে বার বার তিনি ভেঙেছেন খেয়ালখুশি মত। মোহনবাগানের সব খেলোয়াড়রাই খেলেছেন প্রাণ দিয়ে। দলকে জেতাবার দুর্জয় সংকল্প নিয়ে।

ইস্টবেঙ্গলের পরাজয়ের প্রধান কারণ দুই হাফব্যাকের ব্যর্থতা। লীগের খেলায় ইস্টবেঙ্গলের জয়ের চাবিকাঠি ধরে রেখেছিলেন দুই হাফব্যাক এবং ফরোয়ার্ড মিহির বসু। বিপক্ষের আক্রমণকে সামাল দেওয়া এবং নিজেদের আক্রমণের রসদ জোগানো দুটি কাজই প্রশংসনীয় ভাবে করেছিলেন তাঁরা। কিন্তু শীল্ড ফাইনালের দিনে তিনজনই ব্যর্থ হয়েছেন। সুরজিৎ সেনগুপ্ত এবং উলগানাথন, আক্রমণের প্রধান দুই অস্ত্রের ধার সেদিন একেবারেই বোঝা যায়নি।

তবে তরুণ গোলরক্ষক ভাস্কর গাঙ্গুলি এবং নবাগত স্টপার মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য দলকে পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য আপ্রাণ লড়েছেন। অধিনায়ক শ্যামল ঘোষও নিজের দায়িত্ব পালন করেছেন প্রশংসনীয়ভাবে। কিন্তু ফুটবল হচ্ছে গোটা দলের খেলা। দু-একজন ভাল খেলে দলকে জেতানো যায় না। ইস্টবেঙ্গল সেদিন আশামত খেলতে পারেনি তাই হেরেছে।

এ বছর আই এফ এ শীল্ডের খেলা জমেনি। বাইরের দল হিসাবে শক্তিশালী হবে বলে যাদের আশা করা গিয়েছিল শেষপর্যন্ত দেখা গেল তারা সাধারণ শক্তিসম্পন্ন। আই টি আই, পাঞ্জাব পুলিস, হায়দরাবাদের সিটি কলেজ ওল্ড বয়েজ বা হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং, কোন দলের খেলা দেখে দর্শকদের মন ভরেনি।

কৃষ্ণনগর, কলকাতা খড়্গপুর এবং দুর্গাপুরে আই এফ এ শীল্ডের প্রাথমিক পর্যায়ের খেলাগুলি চলে। ইস্টার্ন কম্যাণ্ড ২৪ পরগনা, বি এন আর এবং জামসেদপুর স্পোর্টিং ঐ চার জায়গা থেকে মূল প্রতিযোগিতায় খেলার অধিকার অর্জন করে। এ ছাড়া খিদিরপুর, জর্জ টেলিগ্রাফ ও এরিয়ানকে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে এবং মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল মহমেডান স্পোর্টিং ও আই টি আইকে কোয়ার্টার ফাইনালে রেখে মূল প্রতিযোগিতার তালিকা তৈরি হয়েছিল।

এ বছর শীল্ডের সাতটি খেলা টাইব্রেকারে নিষ্পত্তি হয়েছে। মহমেডান স্পোর্টিং এবং বি এন আর-এর কোয়ার্টার ফাইনাল ছাড়া অবশিষ্ট ছয়টি টাইব্রেকারের খেলা ছিল প্রাথমিক রাউণ্ডের। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দলের দিলীপ দত্ত ইস্টার্ন রেলের বিরুদ্ধে এবং পোর্ট ট্রাস্টের প্রদীপ ভট্টাচার্য জামসেদপুর স্পোর্টিং-এর বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করেন। ২৪ পরগনা দলের মূল প্রতিযোগিতায় ওঠা যথেষ্ট কৃতিত্বের। স্থানীয় দলগুলির মধ্যে বি এন আর-এর সাফল্য উল্লেখ করার মত। সেমিফাইনালে ইস্টবেঙ্গলের কাছে দু গোলে পরাজয় বি এন আর-এর পক্ষে অগৌরবের হয়নি।

আই এফ এ শীল্ডের আকর্ষণ ক্রমেই কমে আসছে। বাইরের নামকরা দলগুলি আসছে না। ফলে শীল্ড খেলাও লীগের মত মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের ঘরোয়া লড়াইতে দাঁড়িয়ে গেছে। অথচ ডুরাণ্ড ও রোভার্স আই এফ এ শীল্ডের মত ঝিমিয়ে পড়েনি। বরদলুই ট্রফি এবং ডি সি এম-এর আকর্ষণ ক্রমেই বাড়ছে। এইভাবে চলতে থাকলে 'ত্রিমুকুটের' অন্যতম আই এফ এ শীল্ড নিজের মর্যাদা হারিয়ে ফেলবে।

আই এফ এ শীল্ড শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার ফুটবল মরসুমও শেষ হল। কলকাতার ময়দান ঝিমিয়ে পড়বে। হকি বা ক্রিকেট নিয়ে উৎসাহ উদ্দীপনা অনেক কম। যেটুকু হয় তাও সাময়িক। ফুটবল আজ সাধারণের খেলা। বাংলার এবং ভারতের প্রাণের খেলা। তাই অগণিত ফুটবল উৎসাহী আগামী ফুটবল মরসুমের জন্য অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করবেন।

ফোটো মনোজিৎ চন্দ

মোহনবাগান বনাম কসমস

মুকুল দত্ত

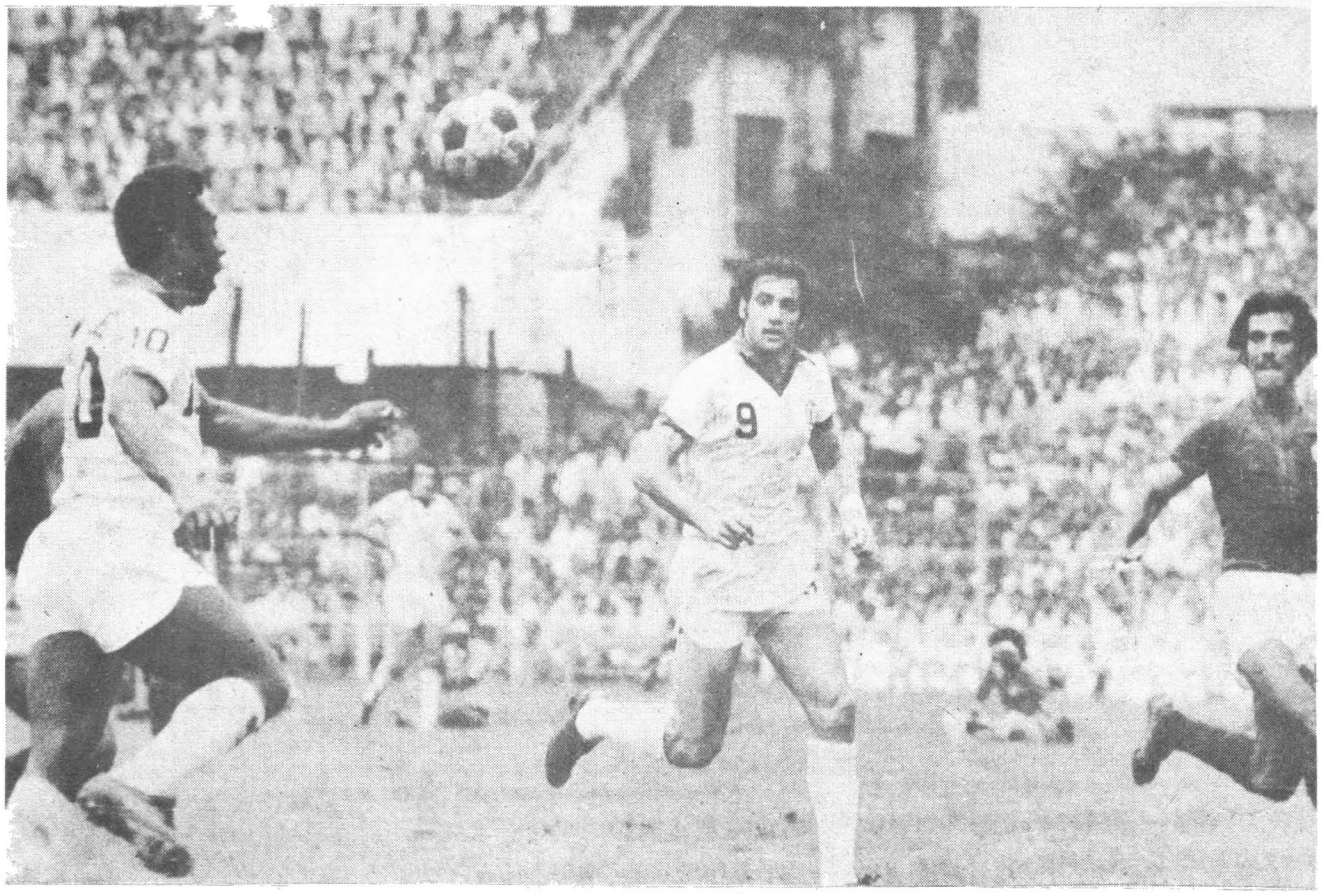

ফোটো বিশ্বরঞ্জন

তোমরা যারা ইডেনের মাঠে গিয়ে কিংবা বাড়িতে বসে টেলিভিশনে গত ২৪ সেপ্টেম্বর মোহনবাগান ক্লাবের সঙ্গে কসমস ক্লাবের খেলা দেখেছ তারা হয়ত তেমন খুশি হতে পারনি। কারণ, পেলেকে নিয়ে কাগজে এত লেখালেখি হয়েছিল এবং সবাই তাঁকে নিয়ে এত মাতামাতি করেছিল যে, প্রত্যেকেরই ধারণা হয়েছিল পেলে খেলার মধ্যে এমন কিছু দেখাবেন যা কল্পনা করা যায় না। তাঁর পায়ের জাদু দেখার ব্যাপারে সবারই আশা ছিল আকাশ-ছোঁয়া।

থাকবারই কথা। কারণ পেলে হচ্ছেন বলের রাজা, সবাই তাঁকে বলে কিং পেলে। যাঁরা খেলার কথা লেখেন, যাঁরা খেলা দেখেন, যাঁরা ফুটবল খেলা ভাল বোঝেন, যাঁরা খেলা শেখান তাঁরা সবাই পেলেকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ফুটবল খেলোয়াড়ের শিরোপা তো দিয়েছেনই—যাঁরা পেলের সঙ্গে খেলেন বা খেলেছেন তাঁরাও বলেছেন, পেলের সঙ্গে কোনো খেলোয়াড়ের তুলনা হয় না। সব দিক দিয়েই তিনি অনন্য।

এই ধারণার সঙ্গে সেদিনের পেলের খেলা মেলেনি বলেই তোমরা খুশি হতে পারনি। সবাই জানত, তোমরাও জানতে ফর্ম থাকার সময় যে খেলা তিনি খেলেছেন সে খেলা আর নেই। থাকলে কি ব্রাজিল বা তাঁর স্যাণ্টোস ক্লাব তাঁকে ছেড়ে দিত? তাঁর বয়স হয়েছে। গতিবেগ কমে গেছে। ৩৭ বছর বয়সে যে-কোন খেলোয়াড় একটু স্লো হতে বাধ্য। কালের ধর্ম কেউ অতিক্রম করতে পারে না। মানুষ মেশিন নয়। সবদিন সবাই একভাবে খেলতেও পারে না। তবু সকলে আশা করেছিল, এখনও তিনি যখন নিয়মিত ফুটবল খেলছেন তাঁর কাছ থেকে নিশ্চয়ই কিছু ভেল্‌কি দেখা যাবে। সত্যিই সে ভেলকি তিনি দেখাতে পারেননি। হাজার হাজার মানুষ, যাঁরা তাঁর খেলা দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন তাঁদের তিনি দেখাতে পারেননি তাঁর চোখ-ধাঁধানো মন-ভোলানো খেলা। তাই সবাই হতাশায় ভুগেছে।

কিন্তু কেউ ভেবে দেখেছে কি কেন পেলে সে খেলা খেলতে পারলেন না? কিংবা কেউ একটু তলিয়ে দেখেছে কি পেলে যেটুকু খেলেছেন তার মধ্যে কতটা দক্ষতা, কতখানি সূক্ষ্ম কাজ ও বুদ্ধির ছাপ ছিল?

সবাই দেখেছে, ফ্রিকিকে পাক-খাওয়ানো একটি বল ছাড়া পেলের আর কোনো শট গোলে যায়নি। তাঁর দুটি শট এবং হেড করা একটি বল ক্রসবারের বেশ উপর দিয়ে চলে যায়। খুব কম সময় নিজে খেলেছেন তিনি। সহ-খেলোয়াড়দের কাছ থেকে বলও পেয়েছেন কম। নিজে খেটে খেলারও খুব একটা চেষ্টা করেননি।

একবার গোল করতে গিয়ে বলটা পা থেকে একটু এগিয়ে যাওয়ায় এবং মোহনবাগান গোলকীপার শিবাজী ব্যানার্জি ডাইভ দিয়ে বলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ায় পেলে শিবাজীর উপর দিয়ে লাফিয়ে গোলের মধ্যে চলে যান। তাই খেলার পরে কেউ কেউ রসিকতা করে বলেন, নিজে গোলের জালে না জড়িয়ে পেলে যদি অন্তত একটি বল জালে জড়াতে পারতেন, অর্থাৎ যদি তাঁর একটা গোল দেখতে পেতাম তাহলেও কিছুটা সান্ত্বনা পেতাম।

না, পেলে কোনো গোল করতে পারেননি। কিন্তু কেউ কি অস্বীকার করতে পারেন যে, পেলে নিখুঁত ফরোয়ার্ড পাস করে আলবার্টোকে দিয়ে একটি গোল করান। এবং আর যে দুটি সুন্দর পাস দেন, তা থেকেও দুটি গোল হতে পারত যদি

কিনালিয়া ও টনি ফিল্ড ঠিকভাবে শট নিতে পারতেন। তাঁর ফ্রি-কিকের পাক-খাওয়ানা বলেও গোল হতে পারত না কি? হয়নি, তার কারণ শটে খুব একটা জোর ছিল না, এবং শিবাজী তৎপরতার সঙ্গে অসাধারণ ডাইভ দিয়েছিলেন।

তোমরা নিশ্চয়ই খুব ভাল করে পেলের খেলা লক্ষ করেছ। আমিও লক্ষ করেছি তাঁর প্রতিটি শট, প্রতিটি মুভমেণ্ট, প্রতিটি পাস, প্রতিটি হেড, প্রতিটি ডজ। খেলেছেন তিনি ৯০ মিনিট। কিন্তু, বিকেল ৩টে ২০ মিনিটের সময় মাঠে নামা থেকে শুরু করে ৫টা ২২ মিনিটে মাঠ থেকে বেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত তাঁর হাবভাব ওয়ার্মিং আপ, বল চাওয়া, বল দেওয়া সবই নোটবুকে টুকে রেখেছি। কতবার তিনি বল পেয়েছেন, ক'বার হেড করেছেন ক'বার বুটের স্টাড থেকে আঙুল দিয়ে মাটি সরিয়েছেন, মাঠের মধ্যে পড়ে গেছেন ক'বার—সে সবও টুকে রেখেছি। এমন কী, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে করমর্দন করার সময় খেলোয়াড়দের লাইনের কত নম্বরে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন তাও লেখা আছে। কেনই বা লিখব না বলো? তোমাদের কাছে পেলের খেলা দেখা যেমন মস্ত সৌভাগ্যের ব্যাপার, তেমন সাংবাদিকদের কাছেও তাঁর খেলার রিপোর্ট লেখা জীবনের এক স্বপ্ন সফল হওয়ার মতো ঘটনা।

এখন নোটবুক মিলিয়ে দেখছি, মোহনবাগানের খেলোয়াড়রা কতবার পেলেকে দৌড়ের মুখে বল ছুঁতে দেননি মাথার উপর দিয়ে বল হেড করে, বা ছুটন্ত বল আগেই শট করে দিয়ে। কিন্তু তাঁর পা থেকে বল কাড়তে পেরেছেন কদাচিৎ। দুতিনবার অবশ্য কেড়েছেন পিছল মাঠে দুতিনজন একসঙ্গে ট্যাকল করে। সারা খেলায় পেলের পাস করা বল একবারও বিপক্ষের পায়ে পড়েনি। একবারও তিনি ভুল পাস করেননি। একবারও শট করেননি উদ্দেশ্যবিহীনভাবে। নিজ খেলোয়াড়ের কাছে বল দিয়েছেন যেন বলের উপর প্রাপকের ঠিকানা লিখে, এবং পায়ের ছোট ছোট কাজে বিপক্ষ খেলোয়াড়কে ধোঁকা দিয়ে। তার মধ্যে দুটি কিক ছিল দেখার মতো। প্রায় পাঁকে ভরা নরম মাঠ, যে মাঠে খেলতে পেলে একেবারেই অনভ্যস্ত, সেই মাঠে ওইটুকু খেলার মধ্যেও বোঝা গিয়েছে তিনি কী অসাধারণ খেলোয়াড়। তবু অস্বীকার করার উপায় নেই, পেলেকে আমরা ঠিকভাবে পাইনি।

কেন পাইনি? মাঠের কথা আগেই বলেছি। প্রতিকূল পরিবেশ দেখে নিজেকে নিশ্চয়ই একটু গুটিয়ে রেখেছিলেন। যখন দেখলেন শট লক্ষভ্রষ্ট হল, এবং দুবার মাঠের মধ্যে পড়ে গেলেন ট্যাকল সামলাতে, তখন বোধহয় মনে করলেন খেলা থেকে বিদায় নেবার মুখে ঝুঁকি নেওয়া উচিত হবে না। প্রকৃতপক্ষে এটাই ছিল পেলের জীবনের শেষ বড় খেলা। ফুটবল থেকে ওঁর বিদায়ের জন্য, নিউজার্সিতে অনুষ্ঠিত ব্রাজিলের স্যাণ্টোস ক্লাব ও কসমস-এর খেলাটি তো ছিল ওঁর চোখ থেকে জল ঝরানোর খেলা। কলকাতায় মোহনবাগানের খেলোয়াড়রাও কসমস-এর সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য করেঙ্গে-ইয়ে-মরেঙ্গে পণ করে মাঠে নেমেছিলেন। পেলেকে বাধা দেওয়ার প্রতিজ্ঞা ছিল সবারই মনে। তাই আমরা পেলেকে ঠিকভাবে পাইনি।

শুধু পেলে কেন, কসমস দলে তো বিশ্বখ্যাত আরও বহু খেলোয়াড় ছিলেন। ছিলেন বিশ্বকাপ জয়ী ব্রাজিলের অধিনায়ক কার্লোস আলবার্টো। ছিলেন বিশ্বকাপের সব নামী খেলোয়াড়—ইত্যালির জার্জিয়ো কিনালিয়া, পেরুর র‍্যামন মিফলিন, যুক্তরাষ্ট্রের কিথ এডি, ওয়ের্নার রথ। ব্রাজিল, ইংলণ্ড, যুগোস্লাভিয়া ও তুরস্কের খ্যাতনামা খেলোয়াড়রাও ছিলেন। খেলার ধারা অনুযায়ী তারকাখচিত ওই কসমস দলটিই তো হেরে যেতে পারত। কেউ কি কল্পনা করতে পেরেছিল ২—২ গোলে খেলা ড্র হবে?

বিশ্ব ফুটবলে ভারতের স্থান কোথায় আমরা ভালভাবেই জানি। অলিম্পিক ফুটবল খেলোয়াড়দের সঙ্গে বিশ্ব কাপের খেলোয়াড়দের গুণগত পার্থক্যের কথাও আমাদের অজানা নয়। যোগ্যতার পরীক্ষায় পার হয়ে অলিম্পিকে আমরা যেতে পারছি না ১৯৬৪ সাল থেকে। ১৯৬২ থেকে পাচ্ছি না এশীয় ফুটবলে কোনো স্থান। সেই ভারত দলও নয়—ভারতেরই একটি দল মোহনবাগান। সেই মোহনবাগান কীভাবে ফুটবলের রাজা পেলে এবং বিশ্ব তারকাদের জার্সির রং কিছুটা ম্লান করে দিল? কারণ, মাঠের অবস্থা, পরিবেশ এবং মরণপণ সংগ্রাম। সফর করতে করতে আর অভিনন্দনের অত্যাচারে কসমস খেলোয়াড়রা বোধহয় একটু ক্লান্তও হয়ে পড়েছিলেন।

তবু নিশ্চয়ই কসমস খেলোয়াড়দের কাছ থেকে আমরা কিছু শিক্ষা পেয়েছি। একজন ব্যাক হয়েও উপরে উঠে গিয়ে কীভাবে অ্যালবার্টো গোল করেছেন দেখেছি। দেখেছি কিনালিয়ার পায়ের কাজ ও জায়গা বদল করে খেলার সুন্দর পদ্ধতি এবং অকল্পনীয় কিছু না হলেও অল্পপ্রয়াসের মধ্যে পেলের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মূর্তিটি। তার চেয়েও তোমাদের বড় লাভ পেলের উপদেশ, তোমাদের উদ্দেশে পেলের উক্তি। কী সেই উক্তি? সহজ এবং সরল আচরণ মানুষের বড় সম্পদ এবং খেলাই হোক বা জীবনের অন্য কোনো ক্ষেত্রেই হোক ঐকান্তিক সাধনায় সিদ্ধি অনিবার্য। খেলোয়াড়দের তিনি আরও উপদেশ দিয়ে গেছেন ঃ কোনোরকম নেশা করবে না, গুরুজন ও কোচের আদেশ অমান্য করবে না, ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রেখে কর্তব্যকর্ম করে যাবে। আকাশবাণীতে এই সুন্দর কথাগুলি বলেছেন পেলে। ছোটদের তিনি সবচাইতে বেশি ভালবাসেন। তাঁর এই খেলাটি দেখে তোমাদের মন না ভরলেও তাঁর উপদেশ শুনে চললে জীবনে তোমরা সফল হবেই।

শিক্ষাজগৎ ও সরকার

- পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকার চান প্রত্যেকটি স্কুলে ভালোভাবে লেখাপড়া চলুক,—সকল বিশৃঙ্খলা দূরে থাক।
- পরীক্ষায় টোকাটুকি বন্ধ হোক।
- প্রত্যেকটি স্কুলে শৃঙ্খলা যাতে বজায় থাকে, ভালোভাবে পড়াশোনা চলে, সেজন্য প্রত্যেকটি ছাত্রকেই নজর দিতে হবে।
- নিরক্ষরতা আমাদের জাতীয় জীবনের অভিশাপ—দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করতেই হবে।
- শিক্ষাজগৎকে দুর্নীতিমুক্ত করে শিক্ষার প্রসারে সকলের সহযোগিতাই সরকারের কাম্য।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

"আমিই খেলতে পারিনি" চিরঞ্জীব

কলকাতায় ফুটবলের রাজাকে মুকুট পরানো হয়েছিল

চব্বিশে সেপ্টেম্বর ইডেনে খেলার আগে ফুটবল-সম্রাট পেলের নামে আমরা পাগল ছিলাম। কিন্তু মোহনবাগান-কসমসের খেলার পরে সেই পেলের নামে আমরা ছি ছি করেছি। কেউ বলেছেন, পেলে খেলতে পারেন না। কেউবা বলেছেন বয়স না হয় সাঁইত্রিশ হয়েছে, কিন্তু দু-পাঁচ মিনিটের জন্যও জাদু দেখাতে পারলেন না কেন? কেউ এমনও মন্তব্য করেছেনঃ ইনি নকল পেলে।

স্যাণ্টোজ বা ব্রাজিলের সেই ব্ল্যাক পার্ল পেলে কিন্তু অতুলনীয়ই রয়েছেন। বিশ্ব ফুটবলের আজও তিনি অবিসংবাদী সম্রাট। পয়লা অক্টোবর নিউইয়র্কে কসমস-স্যাণ্টোস ফেয়ার-ওয়েল ম্যাচের মাঝে ও পরে দুই দলের হয়ে খেলার সময় তিনি দশ নম্বর জার্সি চিরকালের জন্য খুলে ফেললেও তাঁর স্থান দখলের মত ফুটবলার আজও জন্মায়নি। শেষ খেলাটিও এই কথা আবার বলেছে।

তবে, এই ফুটবল-জাদুকর কলকাতায় সকলকে হতাশ করেছেন। তিনি মাঠে একটুও নড়াচড়া করেননি। মোহনবাগানের প্রায় প্রত্যেকেই তাঁর পা থেকে বল কেড়ে নিয়েছেন।

তাই বলে কি পেলের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়ে গেছে? ওই একটি খেলা কি তাঁর জীবনের সব খ্যাতি সব কৃতিত্ব ম্লান করে দিয়েছে? কারও কারও ধারণা অবশ্য তাই। আসলে পেলে যেমন ছিলেন তেমনই আছেন। বয়সের ভারে তাঁর গতি কিছুটা কমেছে, কিন্তু তাঁর স্কিল, ফুটবল নিয়ে জাদু সৃষ্টিতে আজও তিনি সবার উপরে। ইডেনে যে পেলে সবাইকে হতাশ করেছেন সেই পেলেই আবার কয়েকদিন আগে চীন ও জাপানে দর্শকদের মাতিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু কলকাতায় কেন এমন হল?

নব্বই মিনিট মাঠে ছিলেন এতবড় একজন খেলোয়াড়। তাঁকে আমরা প্রাণভরে দেখেছি—আমি বলব এটাই বড় পাওয়া। খেলা তিনি যা দেখিয়েছেন তাও কি কম? তাঁর ফ্রি-কিক্ বা হেডে যদি গোল হত! অমন শট ও হেড কেউ কখনও দেখেছেন কলকাতার ফুটবলে? কিংবা, সতীর্থদের অমন দ্রুত পাস দেওয়া?

থাক এসব কথা। তিনি কেন নড়েচড়ে খেলেননি? প্রথমেই ধন্যবাদ তাঁদের, যাঁরা ম্যাচের আগের দিন কসমস ও পেলের প্র্যাকটিস ম্যাচে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কেননা, ম্যাচের আগে ইডেনের নরম মাটি দেখলে ২৪ তারিখে ওঁরা কেউ হয়ত নামতেই চাইতেন না! আর, পেলে বোধ হয় স্যুটেড বুটেড হয়ে দর্শকদের দিকে দু আঙুল তুলে শুধু 'ভি' দেখিয়ে ফিরে আসতেন ভি আই পি ব্লকে।

সেদিন মাঠে নেমেই যখন দেখলেন পা ডুবে যাচ্ছে নরম মাটিতে, এবং বল বাউন্স করছে না একটুও, পেলে তখনই ধরে নেন—এখানে খেলা অসম্ভব। কসমসের প্রত্যেকেরই অসুবিধা হয়েছে এই মাঠে। আর পেলের দেহ তো বেশ ভারি, পঁচাত্তর কিলো ওজন। ছুটতে গেলে ধপাধপ পড়ে যাবেন। শুরুর দিকে দু'বার পড়ে যাওয়ার পর তাই তিনি নৈপুণ্য দেখাতে একটুও সচেষ্ট হননি। এইরকম মাঠে খেলতে অনভ্যস্ত (ওঁরা খেলেন অ্যাসট্রো টার্ফে) পেলে তাই একদম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সময় কাটিয়েছেন। পেলে অবশ্য কথা রেখেছিলেন। ম্যাচের আগের দিন গ্র্যাণ্ড হোটেলে সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি আমাদের প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেনঃ আমি সারাক্ষণ মাঠে থাকব, তা যত বৃষ্টি হোক না। আসলে তিনি তখন বুঝতেই পারেননি যে, ইডেনের অবস্থা অত খারাপ। পেলে বৃষ্টিকে ভয় পান না বোঝা গেল, নিউ জার্সিতে তাঁর ফেয়ারওয়েল ম্যাচেও খেলার সময় প্রায় সারাক্ষণ বৃষ্টি হয়েছিল। বৃষ্টি হলেও অ্যাসট্রো টার্ফের মাঠে তাঁর খেলতে অসুবিধা হয়নি।

মানুষ বড় হলে, তাঁর সবকিছুই বোধ হয় বড় রকমের হয়। খুশিমত সব করা যায় না। কলকাতায়ও তার ব্যতিক্রম ছিল না। গ্র্যাণ্ড হোটেলের ৩১৭ নম্বর ঘরে তাঁকে বন্দী অবস্থাতেই কাটাতে হয়। হোটেলের সুইমিং পুলেও যেতে পারেননি। পুলের ধারে বিশ্বজয়ী ব্রাজিল দলের অধিনায়ক কালোস আলবার্টো বা কসমস দলের অন্যরা যখন অনুশীলন করেছেন, পেলে তখন চার দেয়ালের ভেতরে বসে দেহরক্ষীর মারফত প্রচুর অটোগ্রাফ খাতায় সই করছেন, কিংবা ব্রাজিলে তিনি যে আধ ডজনেরও বেশি কোম্পানির মালিক—তার নানা ফাইলে চোখ বুলিয়েছেন। ব্রাজিলের সবচেয়ে বেশি আয়করদাতা পেলে নিরাপত্তা কর্মীদের অলক্ষ্যে অবশ্য হোটেলের প্রধান ফটকের কাছাকাছি চলে যান। তবে তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়নি। তিনি দেখতে চেয়েছিলেন এদেশের বালকদের ফুটবল। আমেরিকায় তিনি এখন আট বছর বয়েসের ছেলেদের ফুটবল শেখাবেন। আফশোস করে তিনি তাই বলেনঃ কলকাতার কিছুই তো দেখা হল না।

হাফপ্যাণ্ট পরা পেলের ডান হাঁটুর নীচের অংশ দেখে বুঝতে পেরেছিলাম, ১৯৬৬-র বিশ্বকাপের খেলায় তাঁকে কেমনভাবে প্রহার করা হয়েছিল। মনে হয়, ছয় বা আট মাস আগের কাটা দাগ। সাংবাদিক সম্মেলনে ওই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে পেলে কিন্তু মার খাওয়ার কথা স্বীকারই করেননি। বলেননি, তিনি আহত হওয়ায় ব্রাজিল দুর্বল হয়েছিল, আর তারপরই তাদের পরাজয় ঘটে। তিনি জানান, ব্রাজিলের অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস ছিল, অথচ তেমনভাবে তৈরি হয়নি। তাই আমাদের হার হয়েছিল।

'তা হলে কাগজে যা বেরিয়েছিল তা কি সত্য নয়?'

পেলের বিনম্র জবাবঃ সংবাদপত্রের বন্ধুরা আমাকে ভীষণ ভালবাসেন। আমার সম্পর্কে একটু বেশিই লিখেছিলেন ওঁরা।

২৪ তারিখে খেলা শেষে হোটেলে ফেরার পর জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'নরম ইডেনে আপনার কি অসুবিধা হয়েছিল?'

পেলে মাঠের দোষ দেননি একটুও। যদিও ওটাই ছিল একমাত্র কারণ। এবং ইনসিওরেনসের শর্ত অনুযায়ী তাঁর অমন মাঠে খেলা সম্পূর্ণ বারণ। পেলে সংক্ষিপ্ত জবাব দেন, 'আমিই খেলতে পারিনি।'

ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া

সুব্রত সরকার

ইনভেরারিটি

বেদী

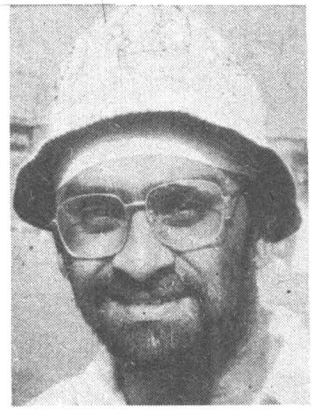

ভারতীয় ক্রিকেট দল অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে একবারও টেস্ট ম্যাচ জেতেনি। অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে মোট ২৫টি টেস্টের মধ্যে তিনবার জয়লাভ করলেও ওদেশে ন'টি খেলার মধ্যে ভারতের হার হয়েছে আটবার—তার মধ্যে চারটি আবার ইনিংস পরাজয়। তবে, অনেকের মতে, কেরি প্যাকারের দৌলতে বর্তমান সফরে ভারতের টেস্ট ম্যাচে জেতার সম্ভাবনা আছে।

এখন অস্ট্রেলিয়ায় গরমকাল। ইংলণ্ডের গত গ্রীষ্মে সফরকারী অস্ট্রেলিয়া দলে যাঁরা ছিলেন তাঁদের অধিকাংশই প্যাকারের সিরিজে খেলবার চুক্তি সই করেছেন বলে দেশের টেস্ট দলের জন্য বিবেচিত হবেন না। তাছাড়া, অস্ট্রেলিয়ার প্রথম সারির খেলোয়াড়দের আরও বেশ কয়েকজন প্যাকার সাহেবের দলে। ফলে, ভারতের বিপক্ষে পাঁচটি টেস্টের সিরিজে যে দল নামবে সেই দলটি ঠিক দুর্বল না হলেও অবশ্যই বেশ অনভিজ্ঞ হবে। অক্টোবরের গোড়ায় দেখা গেছে, নামী খেলোয়াড়দের মধ্যে শুধু ফাস্ট বোলার জেফ টমসনই ভারতকে মুশকিলে ফেলতে পারেন।

অস্ট্রেলিয়ায় খেলার অবসরে মাছ ধরছেন দেশাই, নাদকার্নি, পতৌদি, ওয়াড়েকর (৬৭-৬৮ সাল)

অস্ট্রেলিয়ার নতুন অধিনায়ক কে হবেন তারও কোনো ঠিক নেই। শোনা যাচ্ছে, চশমা-পরা স্কুলমাস্টার জন ইনভেরারিটি (যিনি ১৯৬৮ আর '৭২-এ ব্যাটসম্যান হিসাবে ইংলণ্ড সফর করেছিলেন) নাকি ক্যাপ্টেন হতে পারেন। তবে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটের সাধারণ মান বরাবরই বেশ উঁচু—সিরিজ শেষ হওয়ার আগে অনেক নতুন নাম আমরা নিশ্চয়ই শুনতে পাব। তার মধ্যে মার্ক ও'নীলের নাম থাকতে পারে। প্রাক্তন টেস্ট ব্যাটসম্যান নর্মান ও'নীলের (যিনি দু-বার ভারত সফরে এসেছিলেন, আর ১৯৬০ সালের জানুয়ারিতে ইডেনের টেস্টে শতরান করেছিলেন।) ছেলে মার্কের বয়স মাত্র ১৮, কিন্তু এই বছরে ইংলণ্ডে ল্যাঙ্কাশায়ার লীগ ক্লাব বেকাপ-এর হয়ে তিনি বেশ ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন।

এবারের সিরিজে পাঁচটি টেস্ট হবে পাঁচটি শহরে। প্রথমটি ব্রিসবেনে, শুরু হবে ২ ডিসেম্বর। তারপর খেলা হবে ১৬ ডিসেম্বর পার্থে ৩০ ডিসেম্বর মেলবোর্নে, আর ১৯৭৮ সালের ৭ জানুয়ারি সিডনিতে। শেষ টেস্ট হবে অ্যাডিলেডে, ২৮ জানুয়ারি থেকে।

ভারত পার্থে আগে টেস্ট খেলেনি। দশ বছর আগে যখন শেষবার ভারতীয় দল অস্ট্রেলিয়ায় খেলে, পার্থ তখনও টেস্ট সেণ্টার হয়নি। পতৌদির নবাব মনসুর আলির নেতৃত্বে সেই ১৯৬৭-৬৮-এর টিম খেলে চারটি টেস্ট, আর চারটিতেই হারে। এর কুড়ি বছর আগে '৪৭-৪৮ সালে লালা অমরনাথের অধিনায়কত্বে যখন প্রথম ভারতীয় টেস্ট দল ওদেশে যায়, তখন দুটি খেলা হয়েছিল মেলবোর্নে। আর, মোট পাঁচটি টেস্টের মধ্যে চারটিতে অস্ট্রেলিয়া খুব সহজেই জেতে।

তবে, সেই তিরিশ বছর আগেকার ভারতীয় দলকে আজও নাকি অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা মনে রেখেছেন। ভারত স্বাধীন হওয়ার পরে শুধু ক্রিকেট কেন, আন্তর্জাতিক ক্রীড়া-মহলে সেটাই ছিল তার প্রথম অভিযান। দল নির্বাচনে সেবার অনেক অসুবিধা দেখা দিয়েছিল। প্রথমে যে সফরকারী দলের নাম ঘোষণা করা হয়েছিল তার মধ্যে ছিলেন বিজয় মার্চেন্ট, মুস্তাক আলি আর রুসি মোদির মতন দারুণ ব্যাটসম্যানেরা। ছিলেন ফজল মামুদের মতন উঠতি পেস বোলার। তবে ফজল সদ্য-আবির্ভূত পাকিস্তানে থাকবেন ঠিক করেন। তাঁর নিজের টেস্ট জীবন আরম্ভ হয় আরও পাঁচ বছর পরে। তাছাড়া, মার্চেন্ট আর মোদি শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ না থাকার কারণে সফর করবেন না বলে স্থির করেন। মার্চেন্ট দলের অধিনায়ক মনোনীত হয়েছিলেন। তাঁর বদলে অমরনাথ হলেন ক্যাপ্টেন, আর মুস্তাক সহ-অধিনায়ক। কিন্তু সেই সময়ে তাঁর দাদার মৃত্যু ঘটায় মুস্তাকেরও অস্ট্রেলিয়া যাওয়া হল না। এই চারজনের স্থান পূরণ করার জন্যে যাঁদের দলে নেওয়া হল তাঁদের কেউই এঁদের মতো উঁচুদরের প্লেয়ার ছিলেন না।

সেই সময়ে অস্ট্রেলিয়ার ক্যাপ্টেন ছিলেন ডন ব্র্যাডম্যান। কয়েক মাস পরে তাঁর নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়া দল ইংলণ্ডকে তাঁদের নিজেদের দেশে ৪—০ টেস্টে হারিয়ে দেয়। ব্র্যাডম্যানের ওই দলকে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ টেস্ট একাদশের অন্যতম বলে গণ্য করা হয়। তাঁদের বিরুদ্ধে ভারত জিততে পারবে, এ-কথা কেউ অবশ্য ভাবতেও পারেনি।

সেই সিরিজে ব্র্যাডম্যান নিজে একটি দ্বি-শতরান সমেত

চারটি সেঞ্চুরি করেন। মেলবোর্নে তৃতীয় টেস্টে তিনি দলের প্রথম ইনিংসে করেন ১৩২, দ্বিতীয়বার অপরাজিত থাকেন ১২৭ রানে। তবে অ্যাডিলেডে অনুষ্ঠিত পরের টেস্টেই ভারতের বিজয় হাজারেও দলের উভয় ইনিংসে শতরান করার কৃতিত্ব অর্জন করেন। যদিও তাঁর ১১৬ আর ১৪৫ সত্ত্বেও ভারত ইনিংস পরাজয় আটকাতে পারেনি। হাজারের ওই খেলার পরে ব্র্যাডম্যান সবাইকে বলেন, হাজারে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যানদের অন্যতম।

সেই সিরিজের সিডনিতে দ্বিতীয় টেস্টের সময় বৃষ্টি হয় বলে খেলা অমীমাংসিত থেকে যায়। ব্র্যাডম্যান ছাড়া '৪৭-৪৮ সালের ওই খেলাগুলিতে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে শতরান করেন সিড বার্নস্, লিন্ডসে হ্যাসেট আর্থার মরিস আর ১৯ বছরের ছেলে নীল হার্ভে। বোলিংয়ে লিন্ডওয়াল-মিলার পেস জুটি ছাড়া অন্যান্যরাও ছিলেন। প্রথম টেস্টে ভারতের যখন মাত্র ৫৮ আর ৯৮ টোটাল হয়, মিডিয়াম-পেস বোলার আর্নি টশ্যাক পান মাত্র দুই রানে পাঁচটি উইকেট, আর ২৯ রানে ৬টি।

লালা অমরনাথের ব্যাটিং অন্য খেলায় খুব ভাল হলেও টেস্টে তিনি মোটেই সুবিধে করতে পারেননি। হাজারে ছাড়া তরুণ দত্তু ফাদকার একবার ১২৩ করেন ; আর মেলবোর্নে তৃতীয় আর পঞ্চম দুটি টেস্টেই ভিনু মানকড শতরান করেন। কিন্তু ওই সিরিজে অন্য একটি ঘটনার জন্য মানকড়কে আজও অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট অনুরাগীরা চেনেন। দ্বিতীয় টেস্টে ভারতের ১৮৮ রানের উত্তরে যখন অস্ট্রেলিয়া ব্যাট করছে, মানকড় অদ্ভুতভাবে ওপেনার বিল ব্রাউনকে রান আউট করেন। বাঁ হাতে আস্তে বল করতেন মানকড়। একবার বল করতে গিয়ে দেখেন, নন-স্ট্রাইকার ব্রাউন বল ডেলিভারি হবার আগেই ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে গেছেন। চট করে থেমে গিয়ে, ব্যাটসম্যানকে বল না করে মানকড় বোলিং ক্রিজের উইকেট ভেঙে দেন। ব্রাউন পুরো বোকা বনে গিয়ে রান আউট ঘোষিত হন। ছোট-খাট খেলায় এমন ঘটনা হয়ত প্রায়ই হয়, তবে টেস্ট ইতিহাসে ওই ভাবে যে রান আউট করা যায় মানকড়ই তা প্রথম দেখান।

তিনটি অস্ট্রেলিয়ান দল এদেশে আসার পরে ভারত আবার ১৯৬৭-৬৮ সালে পালটা সফর করে। প্রথম দুটি খেলায়

এডেলেডে হাজারের বলে ব্র্যাডম্যান বোল্ড। করেছেন ২০১ (৪৭-৪৮ সাল)

অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক ছিলেন বব সিম্পসন, পরের দুটিতে বিল লরি। আহত থাকায় মনসুর প্রথম টেস্টে খেলতে পারেননি, ভারতের নেতৃত্ব করেন চাঁদু বোর্দে। এই ম্যাচেই আবিদ আলি প্রথম টেস্ট আবির্ভাবে ৫৫ রানে ছটি উইকেট নেন। দ্বিতীয় টেস্টে পতৌদি নেমে দুটি ইনিংসে দারুণ খেলে ৭৫ আর ৮৫ রান করলেও ভারত ইনিংসে হারে। অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসে তিনজন শতরানকারীর মধ্যে ছিলেন ইয়ান চ্যাপেল। আজ তিনি প্যাকারের দলে, তবে টেস্টে তাঁর প্রথম সেঞ্চুরি ভারতের বিরুদ্ধে মেলবোর্নে, সেই ১৫১।

অস্ট্রেলিয়া-সফরকারী প্রথম ভারতীয় ক্রিকেট দল (৪৭-৪৮ সাল)

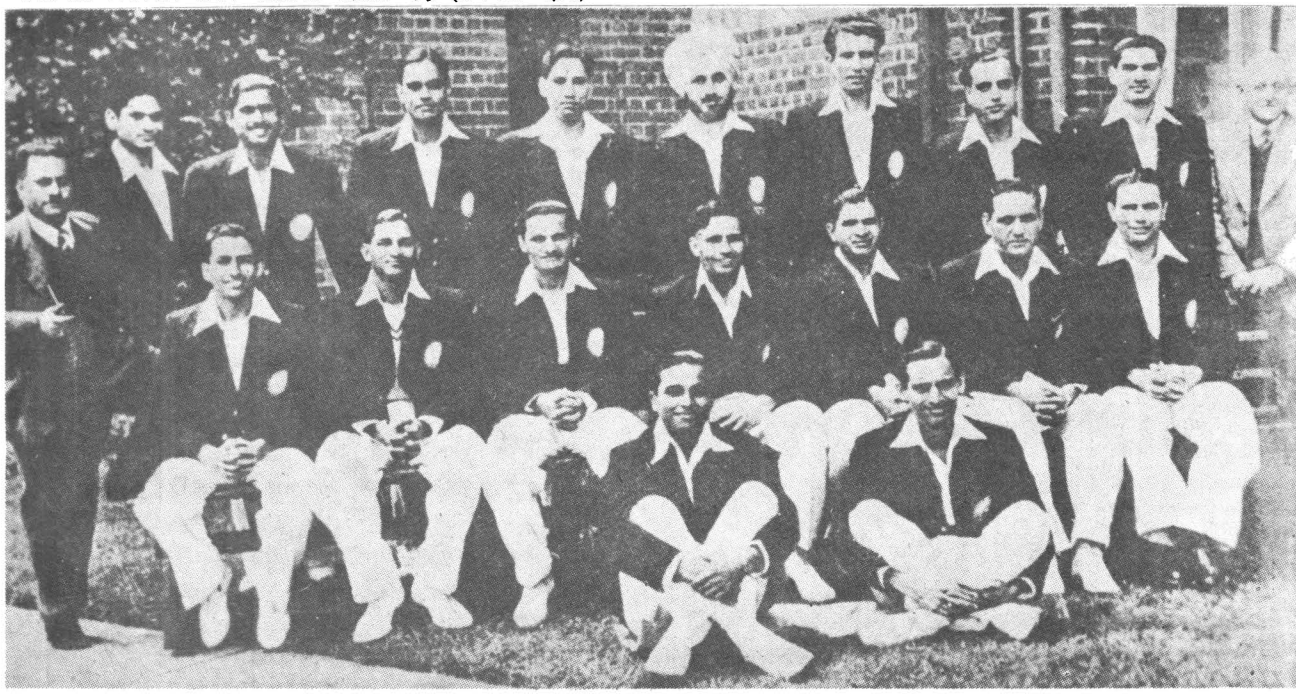

পায়ের গোড়ালিতে দারুণ আঘাত লাগায় সফর শেষ হওয়ার আগেই স্পিনার চন্দ্রশেখরকে দেশে ফিরতে হয়। তাঁর বদলে জয়সীমা অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে দলে যোগ দেন, আর ব্রিসবেনে তৃতীয় টেস্টে করেন ৭৪ আর ১০১। খেলার শেষ ইনিংসে ভারতকে জয়ের জন্য করতে হত ৩৯৫। ষষ্ঠ উইকেট জুটিতে জয়সীমা-বোর্দে শতাধিক রান যোগ করে দলের রানসংখ্যা করেন পাঁচ উইকেটে ৩১০। তবে এরপর অস্ট্রেলিয়ার স্পিন বোলাররা ভারতের ইনিংস শেষ করে দেন। মাত্র ৩৯ রানে অস্ট্রেলিয়া জেতে—ওদেশে ভারতের একটি টেস্ট জেতার সবচাইতে বড় সুযোগ ছিল এটাই।

চতুর্থ টেস্টেও ভারত হারে, তবে চারটি খেলায় পরাজিত দলে থেকেও অফ-স্পিনার প্রসন্ন সিরিজে অসাধারণ বোলিং নৈপুণ্য দেখান। সাতটি ইনিংসে পান মোট ২৫টি উইকেট (তার মধ্যে শেষ দুটি টেস্টে ১৫টি)—এমনি-এমনি কি অস্ট্রেলিয়ার লোকেরা প্রসন্নকে গিবস্, লেকার বা টেফিল্ডের চাইতেও গুণী অফ-স্পিনার বলে মনে করেন!

দেখা যাক ভারতের এবারের ভাগ্য কেমন হয়! তবে ইতিহাসের কথা চিন্তা করলে মনে হয়, এই সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার একজন ব্যাটসম্যানের বিশ্বখ্যাতির সূচনা হবে। নীল হার্ভে যেমন ১৯৪৭-৪৮-এর সিরিজে তাঁর টেস্ট জীবনের ২১টি সেঞ্চুরির প্রথমটি করেন, আর '৬৭-৬৮-এর সিরিজে ইয়ান চ্যাপেল যেমন তাঁর ১৪টি শতরানের পয়লা নম্বর টেস্ট সেঞ্চুরি করেন, ঠিক সেইরকম এবারও এক অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যানের প্রথম টেস্টে শতরান করা উচিত। ইনি হয়ত আগামী দশকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান হয়ে দাঁড়াবেন। কিন্তু কে এই খেলোয়াড়? মার্ক ও'নীল? না কি এমন কেউ, যাঁর নাম আমরা একেবারেই শুনিনি!

মণিমেলার খবর

কেন্দ্রীয় সমাচার

গত ৪ সেপ্টেম্বর বালিগঞ্জ সত্যভামা হাই স্কুল প্রাঙ্গণে ছোটদের আবৃত্তি প্রতিযোগিতা হয়। বিভিন্ন বিদ্যালয়, প্রতিষ্ঠান ও মণিমেলা কেন্দ্র থেকে ২৫০জন ছেলেমেয়ে বিভিন্ন বিভাগে প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। **ফলাফল** গুণানুসারে সাজানো হল : ক বিভাগ—অপর্ণা সেনগুপ্ত, রুবিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়, রিনি কুণ্ডু, সঞ্জয় অধিকারী, রুম্পা গুঁই, ধ্রুব দে, ঝুনু চক্রবর্তী, জয়তী পাল, রুপু চট্টোপাধ্যায় ও অনিন্দিতা দাস। খ বিভাগ—অভিজিৎ চক্রবর্তী, রিঙ্কু দাস, তথাগত ভট্টাচার্য, কৌশিক চট্টোপাধ্যায়, সোনালী বসু, মৌসুমী সরকার, অপরাজিতা দাস, চম্পা এন্ডো, গার্গী চৌধুরী ও সুপ্রতিম রায়। গ বিভাগ—মহুয়া চন্দ, দেবাশিস চৌধুরী, সুকান্ত সেনগুপ্ত, ইতিকা দাশগুপ্ত, পুতুল চক্রবর্তী, নুপুর সাহা, দেবব্রত নাগ, স্বপ্না হাজরা, শুভ্রা মিত্র ও শুভ্রা মৈত্র। ঘ বিভাগ—অনামিকা নন্দী, মধুমিতা বসু, স্বপ্না সরকার, কেতকী সেন, শম্পা চৌধুরী মিত্রা বসু, শ্বাতী ঘোষ, নিবেদিতা নাহা, শ্রাবণী সরকার ও রত্না সাহা। ঙ বিভাগ—পার্থ ভট্টাচার্য ও ভবানীশংকর গুপ্ত। চ বিভাগ—সুনিপা সেনগুপ্ত, মনুয়া চন্দ ও সুব্রতা দত্ত।

মণিমেলা মহাকেন্দ্রের নিয়মিত শাখা কেন্দ্রগুলি গত ১৭ সেপ্টেম্বর শরৎচন্দ্রের এবং ২৯ সেপ্টেম্বর বিদ্যাসাগরের জন্মোৎসব মর্যাদার সঙ্গে পালন করে।

আঞ্চলিক সংবাদ

কোলবেল্ট আঞ্চলিক কুচকাওয়াজ প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে উদয়ন মণিমেলা, শ্রেষ্ঠ আদেশদানকারী বিবেচিত হয় মণিমেলারই চৈতালী ঘোষ। উত্তর-মধ্য কলকাতা আঞ্চলিক কুচকাওয়াজ প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে রবীন্দ্রপল্লী মণিমেলা এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে অভ্যুদয় মণিমেলা। শ্রেষ্ঠ আদেশদানকারী রবীন্দ্র পল্লী মণিমেলার শ্রীমণিমালা ঘোষ। বারাসত আঞ্চলিক কুচকাওয়াজ প্রতিযোগিতায় প্রথম নারায়ণ পল্লী মণিমেলা, দ্বিতীয় পল্লী মণিমেলা; তৃতীয় বিধান মণিমেলা। নৈহাটি আঞ্চলিক কুচকাওয়াজ প্রতিযোগিতায় প্রথম ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিতীয়—গরিফা মণিমেলা; তৃতীয়—ব্লু স্টার মণিমেলা। শ্রেষ্ঠ আদেশদানকারী—গরিফা মণিমেলার বিজয়া দাস। আসানসোল—বার্নপুর অঞ্চলের প্রাক্-নায়ক শিক্ষণশিবির, আবৃত্তি ও সংগীত প্রতিযোগিতা সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়। বনগাঁ আঞ্চলিক কর্মী শিক্ষণশিবির ৩—১১ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয়।

কোলবেল্ট আঞ্চলিক খো-খো প্রতিযোগিতায় বিজয়ী-চৈতালী মণিমেলা; বিজিত চিনাকুড়ি অনির্বাণ মণিমেলা। নৈহাটি আঞ্চলিক খো-খো প্রতিযোগিতায় ছেলেদের বিভাগে বিজয়ী—ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র; বিজিত—ব্লু স্টার এবং মেয়েদের বিভাগে বিজয়ী ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র এবং বিজিত—গরিফা মণিমেলা।

ঋণ সন্দেশ

যাদবপুরের অনির্বাণ মণিমেলা ১৩ আগস্ট মণিভাই বোনদের জন্য বক্তৃতা, সংগীত, কুচকাওয়াজ, সমবেত ব্যায়াম ও বসে-আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল। আসানসোলের সিস্টার নিবেদিতা মণিমেলা ১২ আগস্ট পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ আয়োজিত শরৎ জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে বিশেষ প্রশংসা অর্জন করে। কল্যাণীর অনিন্দিতা মণিমেলার ষষ্ঠ বার্ষিক উৎসব গত ১৪ আগস্ট অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতার যাদবপুর কলোনি মণিমেলার ৩৬তম প্রতিষ্ঠা-উৎসব উপলক্ষে মণিভাইবোনেরা একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। গার্ডেনরিচের আদর্শ মণিমেলার ৩৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে একটি আবৃত্তির আসরের আয়োজন করা হয়। বাঁকুড়ার শ্রীসারদা দেবী মণিমেলার ভাইবোনেরা সম্প্রতি এক সুন্দর ক্রীড়া প্রদর্শনীর আয়োজন করে সকলের প্রশংসা অর্জন করে।

উঃ!
কী দাঁতের যন্ত্রনা!

নোলে, তোকে ডাক্তারখানায় নিয়ে যাই, দাঁতটা তুলে দিক!

আমার জানা ডাক্তার আছে, কিচ্ছু লাগবেনা!

আমি একেবারে সেরে গেছি, আর একটুও ব্যথা নেই!!

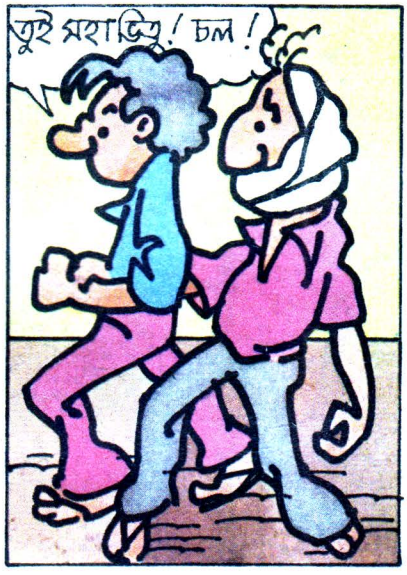
তুই মহাভিতু! চল!

নোলেদাকে নিয়ে ফুকুদা ডাক্তারখানায় পৌঁছল ...
ডা: গুঁই
দন্ত চিকিৎসক
ঐ দেখ ডা: গুঁই-এর চেম্বার, নামকরা ডাক্তার!

অনেক দেরি হচ্ছে ডাক আসতে, ডা: গুঁই ভীষণ ব্যস্ত ডাক্তার! অপেক্ষা করতে করতে ফুকুদা ঘুমিয়ে পড়ল ...

সুযোগ বুঝে নোলেদা হাওয়া!

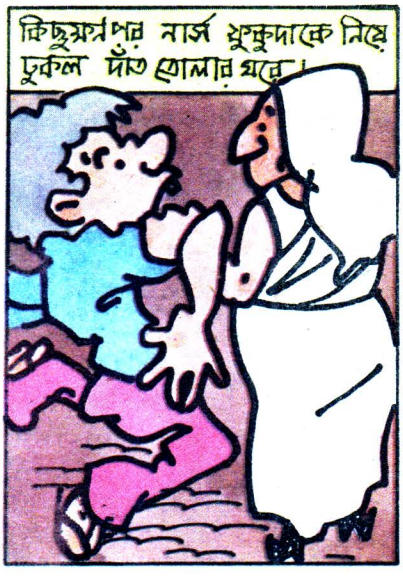
কিছুক্ষণ পর নার্স ফুকুদাকে নিয়ে ঢুকল দাঁত তোলার ঘরে।

আঁকো

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

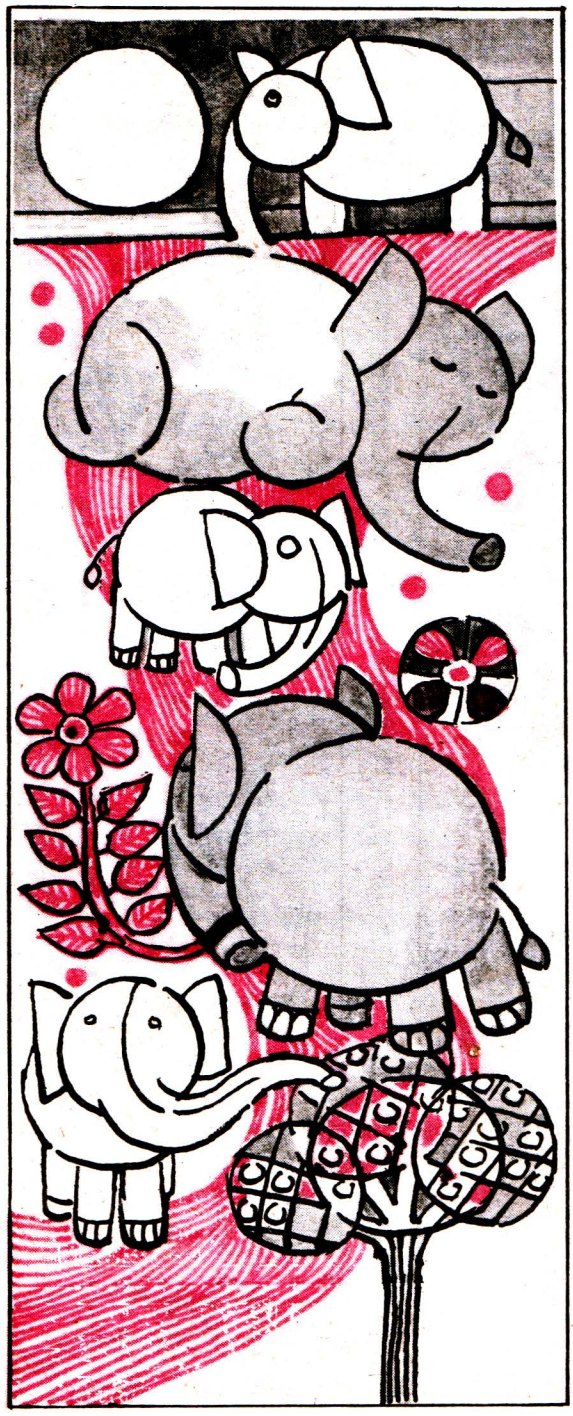

একই গোল আকার দিয়ে যেমন পাখিকে ধরা যায়, তেমন করেই ধরা যায় বিরাট চেহারার হাতিকেও। নমুনা দেখে চেষ্টা করে দেখ আর কাউকে ধরতে পার কি না !

শেখো

কারিগর

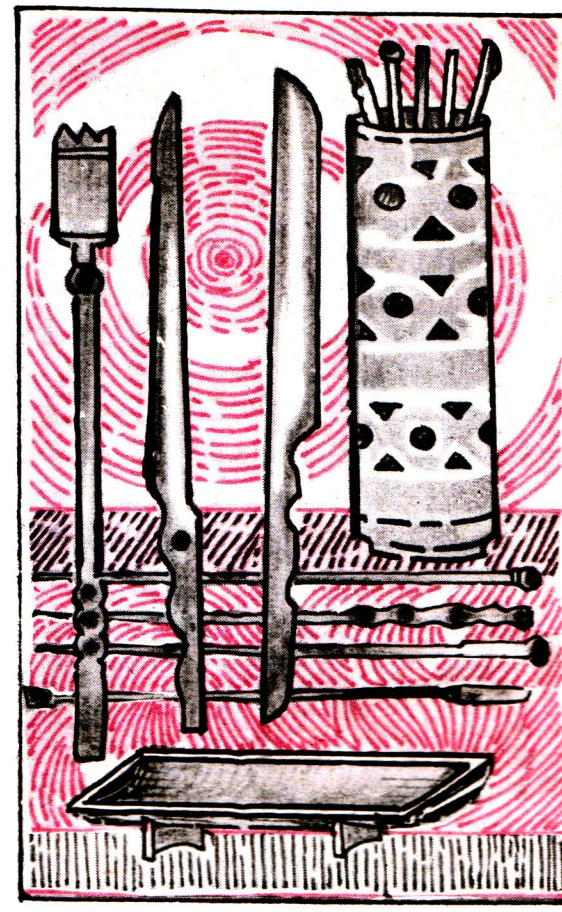

বাঁশের কাজ

বাঁশের কাজের জন্যে যা যোগাড় করেছ তা দিয়েই তৈরি করে নাও তোমার বাড়ির প্রয়োজনের নানান জিনিস। খাবার সময় দরকার নুনের চামচ, তরকারি আর স্যালাড তোলার দাঁতওয়ালা চামচ, মাখন লাগাবার, সেদ্ধ আলু বা নরম ফল কাটার ছুরি, এ সবই বাঁশ দিয়ে অনেক সহজে করে নিতে পার। এ সবের জন্যে বাঁশের টুকরো দিন দুই জলে ভিজিয়ে ছুরি দিয়ে কেটে পছন্দমত আকার তৈরি করে নাও। মাখনের ছুরির বেলায় ইচ্ছে করলে দুদিকে ধার সমান রাখবে, কেবল ফল কাটার ছুরির এক দিকে ধার রাখবে।

এসব ছুরি, চামচ, কাঁটা রাখার জন্য খাবার টেবিলে বা রান্নাঘরে একটা পাত্র সহজেই তৈরি করে নিতে পার। বাঁশের দুদিকে গিঁট রেখে আধাআধি ভাগ করে নিয়ে গিঁটের দুপাশে বা মাঝামাঝি (নমুনা দেখ) ঠেকো দিয়ে দাঁড় করিয়ে নিলেই চমৎকার পাত্র তৈরি হবে। শিরিস, ছুরি এসব দিয়ে খুব ভালভাবে পালিশ করবে। এইভাবে অনেক কিছুই বাড়িতে বসে বানাতে পারো অনায়াসে।

জেনে রাখো

১। কাজের সময় বাঁশে অনেক সময় চিড় ধরে যায়। তাতে বাঁশের মিহি গুঁড়ো আর ফেভিকল মিশিয়ে মাখিয়ে দিলে চিড় ধরা বন্ধ হবে। ২। ঘুনধরা বাঁশ কখনোই ব্যবহার করবে না। ৩। খাবার ঘরের জন্য তৈরি জিনিস দিন কয়েক তেল (সরষে বা নারকেল) মাখিয়ে রেখে দিলে মজবুত হবে। এ সংখ্যায় কেবলমাত্র রান্নাঘরের কয়েকটি জিনিসপত্রের কথাই বলা হল।

শিশুদের–কিশোরদের–যত ছোটদের বই

শৈলেন ঘোষ সমকালের একমাত্র সফল শিশুসাহিত্যিক, যিনি বাংলা শিশুসাহিত্যের রূপকথার ঋদ্ধিময় ধারাটিকে একক প্রযত্নে এখনও অব্যাহত রেখেছেন—সবল স্কন্ধে বহন করে চলেছেন দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের মহান কালজয়ী ঐতিহ্য। তাঁর অসাধারণ কয়েকটি বই :

অরুণ বরুণ কিরণমালা ৩·০০
মিতুল নামে পুতুলটি ৪·০০
ছোট্ট সোনার গল্প শোনা ৬·০০
বাজনা ৫·০০
হুপ্পোকে নিয়ে গপ্পো ৫·০০
আমার নাম টায়রা ৫·০০

শিবরাম চক্রবর্তী
হর্ষবর্ধন নিত্যনূতন ৪·০০
শিবরামের বারো আড়ি ৫·০০
দিগ্বিজয়ী হর্ষবর্ধন ৫·০০
এক মেয়ে ব্যোমকেশের কাহিনী ৬·০০

বিমল কর
ওআণ্ডার মামা ৬·০০
কাপালিকরা এখনও আছে ৭·০০

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু ও ময়ূখ চৌধুরী
নিশীথ রাতের আহ্বান ৩·০০

গৌরকিশোর ঘোষ
দুপুর দুপুর ৩·০০

আনন্দ বাগচী
বনের খাঁচায় ৫·০০

পার্থসারথি চক্রবর্তী
কেমিক্যাল ম্যাজিক ৪·০০
চিকিৎসাবিজ্ঞানের আজব কথা ৪·০০
রসায়নের ভেল্‌কি ৩·০০
ম্যাজিকের মত মজা ৫·০০

মৌমাছি (বিমল ঘোষ)
রাজার রাজা ৭·০০

শঙ্করীপ্রসাদ বসু
আমাদের নিবেদিতা ৬·০০

প্রেমেন্দ্র মিত্র
আগ্রা যখন টলমল ৫·০০
যাঁর নাম ঘনাদা ৫·০০

পাপু (সুব্রত সরকার)
পাপুর ছবি সঙ্গে ছড়া ৫·০০
পাপুর বই ৬·০০

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
ভয়ের মুখোশ ৫·০০
পাথরের চোখ ৬·০০
সীমানা ছাড়িয়ে ৬·০০
পাঁচমুণ্ডীর আসর ৬·০০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
ভূমিকম্পের পটভূমি ৪·০০

ইন্দ্রমিত্র
বিদ্যাসাগরের ছেলেবেলা ৫·০০
শরৎ কথামালা ১০·০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
ভয়ংকর সুন্দর ৪·০০
সত্যি রাজপুত্র ৫·০০
তিন নম্বর চোখ ৫·০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
ঘণ্টাদার কাবলু কাকা ৫·০০
অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ এবং ৬·০০
তপন চরিত ৫·০০

মতি নন্দী
ননীদা নট আউট ৪·০০
স্ট্রাইকার ৬·০০
স্টপার ১০·০০
কোনি ৬·০০

সমরজিৎ কর
একটি সংকেতের জন্যে ৬·০০

নারায়ণ চক্রবর্তী
হলদে সবুজ কুণ্ঠাল ১০·০০

পূর্ণেন্দু পত্রী
কী করে কলকাতা হলো ৪·০০
ছড়ায় মোড়া কলকাতা ৪·০০

বুদ্ধদেব গুহ
ঝজুদার সঙ্গে জঙ্গলে ৫ ০০
ঝাঁকিদর্শন ৬·০০

সুকুমার রায়
সমগ্র শিশুসাহিত্য ১০·০০
সুকুমার সাহিত্যসমগ্র (১ম) ২৫·০০
সুকুমার সাহিত্যসমগ্র (২য়) ৩০·০০
জীবজন্তু ৮·০০

সত্যজিৎ রায়
বাদশাহী আংটি ৫·০০
এক ডজন গপ্পো ১০·০০
প্রোফেসর শঙ্কুর কাণ্ডকারখানা ৫·০০
গ্যাংটকে গণ্ডগোল ৫·০০
সোনার কেল্লা ৬·০০
বাক্স-রহস্য ৫·০০
কৈলাসে কেলেঙ্কারি ৫·০০
সাবাস প্রোফেসর শঙ্কু ৬·০০
রয়েল বেঙ্গল রহস্য ৫·০০
আরো এক ডজন ১০·০০
জয় বাবা ফেলুনাথ ৬·০০
ফটিকচাঁদ ৮·০০
ফেলুদা এণ্ড কোং ৮·০০

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার
ছেলেদের বিবেকানন্দ ২·০০

সরলাবালা সরকার
পিনকুর ডাইরি ৪·০০

মনোজ বসু
ওস্তাদ নটবর ৬·০০

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
ক্লাস সেভেনের মিস্টার ব্রেক ৪·০০

লীলা মজুমদার
বাতাসবাড়ি ৪·০০

অমরনাথ রায়
দেশবিদেশের বিজ্ঞানী ১০·০০

আশাপূর্ণা দেবী
রাজকুমারের পোশাকে ৪·০০

সমরেশ বসু
মোক্তারদাদুর কেতুবধ ৫·০০

অমিতাভ চৌধুরী
তেপান্তরের মাঠে ৩·০০

ননীগোপাল চক্রবর্তী
চরকা বুড়ী ৪·০০

গিরিধারী কুণ্ডু
টংসা চু ৫·০০

সুবোধ ঘোষ
সেই অদ্ভুত অভ্রখনি ৫·০০

বিমল মিত্র
রাজা হওয়ার ঝকমারি ৭·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯
ফোন ৩৪৪৩৬২

everest/1036/PP-bn